দেওয়া হয়। আধুনিক কালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার বহু খ্যাতিমান পুরুষ বিক্রমপুরের লোক। বিপ্রকল্পলতিকা নামক গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় বিক্রম সেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এ অঞ্চলের পাতক্ষীর, দই, সন্দেশ ও নারিকেলের জিরা-চিড়ার খ্যাতি আছে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্র-শাসন আবিস্কৃত হইয়াছিল। খড়্গ বংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাঞ্চনা। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির নেহকাষ্ঠিগ্রামে পীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে কিছু জমি দান করেন। "লঘুভারত" গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেন নিৰ্ম্মিত বলিয়া কথিত একটি বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত। রামপাল দীঘি, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘি এখানে বর্ত্তমান। গত শতাব্দীতে এই স্থানে একজন কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া ৭০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাইয়াছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি সোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহার ২৪টি পাতার প্রত্যেকটি ৩০ ভরি ওজনের। রামপাল একটি বিস্তীর্ণ নগরী ছিল; ইহার নিকটস্থ পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর জোড়াদেউল প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীর গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে নালান্দা মহাবিহারের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের সেনবংশের পতন সম্বন্ধে কথিত আছে সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন রাজা তখন একজন মুসলমান প্রজা ফকিরের আশীর্ব্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রাজনিষেধ সত্বেও একটি গোহত্যা করেন। এক টুকরা মাংস চিলে রাজপ্রসাদে নিক্ষেপ করিলে রাজা অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান প্রজার শিশু পুত্রটিকে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশে শিশুপুত্র নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা মক্কাশরীফে গমন করেন; তথায় হজরৎ আদম তাঁহার করুণ কাহিনী শুনিয়া বহু অনুচর লইয়া রামপালের নিকট আসিয়া কয়েকটি গোবধ করেন। সুতরাং রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কথিত আছে চৌদ্দ দিন যুদ্ধের পর হজরৎ আদম যখন সন্ধ্যায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সহসা আসিয়া তরবারীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। যুদ্ধে আসিবার সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সঙ্গে করিয়া একটি শিক্ষিত পারাবত আনিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যুদ্ধে হারিয়া যাইলে তিনি পারাবতটি ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রাসাদে উহা পৌছাইলে পরিবারবর্গ তাঁহার পরাজয়ের কথা জানিতে পারিবেন। হজরৎ আদমকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় বল্লাল যখন দীঘিতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে পারাবতটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া রাজপুরীতে চলিয়া যায়। রাজ পরিজনের সকলে তখন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া মনের দুঃখে নিজেও অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন; এই জন্য তিনি পোড়া রাজা নামে পরিচিত। রামপালের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি জলাশয় এখনও বিদ্যমান; উহা খনন করিলে বহু পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। প্রবাদ এই অগ্নিকুণ্ডেই রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রামপালের ঠিক উত্তরে কাজী-কসবা গ্রামের দুর্গাবাড়ী নামক স্থানে আদম শহীদ বা বাবা আদমের মসজিদ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সুলতান জলালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত হয়। ইহা ঢাকা জেলার প্রাচীনতম

মসজিদ ; মসজিদের প্রবেশ দ্বারের নিকটে দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ হিন্দু মুসলমান রমণীগণ কর্ত্তৃক সিন্দুর লিপ্ত হইয়া থাকে। বামপার্শ্বের পশ্চিমে আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া গ্রামের মধ্যে কানাইচঙ্গের মাঠ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। কথিত আছে এই স্থানে রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে কানাইচঙ্গ নামক একজন সৈনিক দ্বিতীয় বল্লালের পক্ষে বিশেষ সাহস ও দক্ষতা প্রদশন করেন এবং তাঁহার নাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র কানাইচঙ্গের মাঠ নামে পরিচিত হয়। ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বল্লালসেন নিহত হন এবং তাহার পর হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। আব্দুল্লাপুর গ্রামে মহারাজ বল্লাল সেন নিৰ্ম্মিত মীর কাদিম খালের উপর একটি পুরাতন সাঁকো আজিও বিদ্যমান।

বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটিকে একটি ছোটখাট পরগণা বলা যাইতে পারে; ইহা সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্ত। ইহার এক একটি পাড়া এক একখানি গ্রামের সমান। এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তিনটি ডাকঘর আছে; ইহা হইতেই গ্রামখানির বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মস্থান। এই গ্রামে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট বৌদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বার বছর ধরিয়া দীপঙ্কর সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারে অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালের প্রাচ্য বৌদ্ধদের সর্ব্বপ্রধান স্থান সুবর্ণদ্বীপের (ব্রহ্মের পেগু জেলার সুধর্ম্ম নগর—বর্ত্তমান নাম থেটন) মহাসংঘিকাচার্য্যের নিকট আরও বার বছর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধপণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। তথা হইতে তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক সনির্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করেন। তিব্বতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বতে দীপঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিনী মূর্ত্তির নামকরণ স্পষ্টতঃই তাঁহার জন্মস্থানের নাম হইতেই হইয়াছে। দীপঙ্কর শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্করের গৃহ এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার বীর সেনাপতি রাম মালিক পল্লী কবিতায় স্থান পাইয়াছেন,—

রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রামের মাটি ॥
উঠ্‌লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে ॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি ॥

(ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, যতীন্দ্র মোহন রায়)

রঘুরামপুরের পশ্চিমে সুখবাসপুর গ্রামের দীঘির ধারে রাজা রঘুরায়ের একটি প্রমোদ ভবন ছিল বলিয়া গ্রামটির নাম সুখবাসপুর হয় বলিয়া কথিত। এই গ্রামে একটি সুন্দর তারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে সেরাজাবাদ গ্রামে বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সুধারাম বাউলের আখড়া অবস্থিত। তাঁহার রচিত বহু বাউল সঙ্গীত এ অঞ্চলে চলিত আছে। সেরাজাবাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল আরও দক্ষিণে কামারখাড়া গ্রামের উচচ মঠটি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ; এই গ্রামে একটি দীঘির সংস্কারকালে লব্ধ অতি সুন্দর রজত-নির্ম্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী একটি চতুর্ভুজ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটি সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি, দুই পার্শ্বে রজত নির্ম্মিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি; পাদদেশে অষ্টধাতুর গরুড় ও উপরে অষ্টধাতুর চাল বিদ্যমান। বিগ্রহটি সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূর। বুড়ী-গঙ্গা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত ঢাকা একটি প্রাচীন নগরী। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ স্টীমার পথ ব্যতীত কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ট্রেণে, তথা হইতে জগন্নাথগঞ্জ স্টীমারে ও জগন্নাথগঞ্জ হইতে ট্রেণে কিংবা তিস্তামুখ ঘাট পর্য্যন্ত ট্রেণে, তথা হইতে বাহাদুরাবাদ স্টীমারে এবং বাহাদুরাবাদ হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত ট্রেণে আসা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বেঙ্গালা নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে ঢাকা ও বেঙ্গালা একই শহর। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্ব হইতেই যে ঢাকা নগরীর প্রাধান্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ আসিবার বহু পূর্ব্বে এই স্থানে দুইটি প্রাচীন মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসাকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এইস্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল রাজমহলের নিকট গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে ব্যবসায়ের অসুবিধা ও পর্ত্তুগীজ, মগ ও আহোমদের আক্রমণ হইতে বাংলার পূর্ব্বপ্রান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করা। সম্রাটের নাম অনুসারে রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত হয়। ইসলাম খাঁর নাম হইতে ঢাকা শহরের নবাবপুর ও ইসলামপুর মহাল্লার নাম হইয়াছে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার জন্মস্থান ফতেপুর-শিক্‌রীতে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ কয়েক বৎসর সুবাদার ছিলেন এবং ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ কাশিমের পরিবর্ত্তে সুবাদার নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর শান্তিতে শাসন করিবার পর বিদ্রোহী রাজকুমার শাহ্‌জাহানের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন; শাহ্‌জাহান অল্পকালের জন্য ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান বাংলা ত্যাগ করিলে পর পর কয়েকজন সুবাদারের পর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মশদী সুবাদার নিযুক্ত হন। ইনি চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। পর বৎসর ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহান ইসলাম খাঁকে দিল্লীতে উজির পদে নিযুক্ত করেন এবং পুত্র শাহ্ শুজাকে বাংলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। শাহ্ শুজা ঐ বৎসরই রাজধানী পুনরায় রাজমহলে লইয়া যান। কুড়ি বৎসর দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর পিতার কঠিন পীড়া হইলে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় ও ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্ত্তৃক শাহ্ শুজা পরাজিত হইয়া

সপরিবারে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আবার ঢাকায় আনয়ন করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের ভ্রাতা ও নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ঢাকা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। সুদীর্ঘকাল শাসন করিয়া ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল পরেই আগ্রায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর বাহাদুর খাঁ, ইব্রাহিম খা ও আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌সান ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আজিম উশসানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁর মনোমালিন্য হেতু মুর্শিদকুলী খাঁ রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া যান এবং আজিম উশসান্ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। তখন হইতে ঢাকার শাসনভার নায়েব নাজিমদের উপর অর্পিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পদ পাইলে তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর শাসন ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং তিনি মাসোহারা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গাজী উদ্দীন হায়দার বা পাগলা নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় নবাব নাজিমের পদ উঠিয়া যায়। দেনার দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়; তাঁহার একটি হাওদা নবাবপুরের বসাকগণ ক্রয় করেন এবং জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময়ে উহা এখনও বাহির করা হয়। তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে ঢাকা নগরীর চরম উন্নতির সময়ে পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পোস্তগোলা পর্য্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টঙ্গ নদী পর্য্যন্ত ১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৯,০০,০০০। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে টাভার্ণিয়ার ঢাকায় আগমন করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা পুর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম নামক নবগঠিত ও অল্পকালস্থায়ী প্রদেশের রাজধানী ছিল।

ঢাকার বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ নবাব বংশের সহিত পুরাতন ঢাকার নায়েব-নাজিম প্রভৃতিদের কোনই সম্পর্ক নাই। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম নামে এক ব্যক্তি কাশ্মীরের সুবাদার ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ্ যৎকালে দিল্লী নগরী ধ্বংস করেন সে সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তথা হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী আবদুল্লা ঢাকায় আসিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এইরূপে ঢাকার নবাব বংশের আরম্ভ হয় বহু দিন পর্য্যন্ত ইহারা চামড়া ও সোনার কারবার করিয়া পরে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে বাংলার অন্যতম প্রধান ভূম্যধিকারী হন। এই বংশের নবাব স্যার আব্দুল গনি, স্যার আহ্‌সান উল্লা ঢাকা শহরের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ঢাকায় ইঁহাদের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এখনও ইঁহারা বৎসরে কম করিয়া ৬৫,০০০ হাজার টাকা ধর্ম্ম ও সেবা কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন।

মুঘলদের সময়ে মগেরা ঢাকা ২১৩ বার লুণ্ঠন করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরী লুণ্ঠিত হয়।

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা বা ঢাকা হইতে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিংবদন্তী যে সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার

কিরীটের "ডাক" এই স্থানে পতিত হয়। "ডাক" স্থানীয় শব্দ; কারুকার্য্য প্রতিফলিত করিবার জন্য জড়োয়া গহনার নীচে "ডাক" বসানো হইয়া থাকে। "ডাক" পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ্য হয় এবং ঢাকা নাম প্রাপ্ত হয় এবং দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। অন্যমতে ঢাকেশ্বরী দেবী "ঢাকা" বা গুপ্ত ছিলেন; মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্ব্বে 'ঢাকা' ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী লইয়া আসেন তখন তাঁহার শিবির হইতে ঢাক বাজাইয়া যত দূর পর্য্যন্ত তাহা শোনা গিয়াছিল তত দূর রাজধানীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এই জন্য শহরের নাম হয় ঢাকা। কেহ বা বলেন ঢাক নামক গাছ হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে; আজকাল কিন্তু ঢাক গাছ ঢাকা শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান ঢাকা নগরী দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ হইতে ২ মাইল। ইহা বাংলার দ্বিতীয় শহর। ঢাকার দ্রষ্টব্য স্থান গুলির মধ্যে প্রথমেই বুড়ীগঙ্গা তীরে বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দৃশ্য সত্যই সুন্দর বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ প্রাচ্যের ভিনিস্ বলিয়া থাকেন। বাঁধের পশ্চিম প্রান্তে ঢাকার নবাবদের বৃহৎ ও সুদৃশ্য আধুনিক প্রাসাদ **আহসান মঞ্জিল** অবস্থিত। বাঁধের পূর্ব্ব প্রান্তেও সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধের উপরই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নর্থব্রুক হল অবস্থিত; নিকটেই বাঁধের উপর একটি পুরাতন বড় কামান রক্ষিত আছে। বাঁধের ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর বাসভবন প্রভৃতি অবস্থিত; ইহাদের মধ্যে সুদৃশ্য প্রাচীন ইমারত বড় কাট্‌রা ও ছোট কাট্‌রা উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ শাহ্ শুজা বড় কাট্‌রা নামক সরাইখানাটি নির্ম্মাণ করেন। বড় কাট্‌রার নিকটেই শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত সরাইখানা ছোট কাট্‌রার মধ্যে বিবি চম্পার সমাধি দৃষ্ট হয়; তিনি কে ছিলেন জানা যায় নাই; তাঁহার নাম হইতে স্থানটি চাঁপাতলি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় কাট্‌রার ঠিক্ সম্মুখে বুড়ীগঙ্গার অপর পারে জিঞ্জিরায় বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খা কর্ত্তৃক ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই **জিঞ্জিরার প্রাসাদেই** পলাশীর যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দী দুহিতা ঘেসেটি ও আমিনা বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার বেগম ও শিশুকন্যা বন্দিনী ছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা ডুবাইয়া ইঁহাদের হত্যা করেন বলিয়া কথিত; মৃত্যুকালে ঘেসেটি ও আমিনা বেগম মীরণকে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। মীরণ বজ্রাঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে প্রত্যহ গহেনার নৌকা মাণিকগঞ্জ, ধামরাই, বহর, তালতলা, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, কলাকোপা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে।

বাকল্যাণ্ড বাঁধ ছাড়িয়া একটি রাস্তা নদীর সমান্তরালে পশ্চিমে পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মুঘলটুলি, চক বাজার হইয়া শহরের প্রান্তে লালবাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটি প্রধান রাস্তা বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে উত্তরে কাছারি প্রভৃতি হইয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গিয়াছে। ইহা নবাবপুর রাস্তা নামে পরিচিত। নবাবপুর, উয়ারি, তাঁতিবাজার, বাংলা বাজার, সূত্রপুর, লক্ষ্মী বাজার, শাঁখারি বাজার, আরমানিটোলা, কায়েতটুলি, রমনা প্রভৃতি মহাল্লার নাম ঢাকার বাহিরেও পরিচিত। নবাবপুর রাস্তার নিকটে মানোয়ার খাঁর বাজার সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খা মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্রের নাম বহন করিতেছে। চক বাজারের বড় চক-মসজিদটি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; এই মস্‌জিদে চওড়া ও বড় কিন্তু অনুচ্চ খিলানগুলি আওরঙ্গাবাদ ও আহমদ নগরের

রীতি অনুসারে শায়েস্তা খাঁ এদেশে প্রচলন করেন ; এজন্য ইহা শায়েস্তাখানী ধরণ নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কাট্‌রা মসজিদ এই ধরণে নির্ম্মিত। বুড়ীগঙ্গার তীরের মত চকবাজারেও মুঘল যুগের একটি তোপ পড়িয়া আছে। বাবু বাজারে শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত আর একটি মসজিদ আছে। চক বাজারের নিকট যে স্থানে এখন জেল-হাসপাতাল অবস্থিত ঐ স্থানে মুঘল আমলে ইসলাম খাঁর দুর্গে টাকশাল ছিল। এই টাকশালে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির টাকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। শহরের নারিন্দা মহাল্লায় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত **বিনট বিবির মসজিদ** ঢাকার সর্ব্বপেক্ষা পুরাতন মসজিদ। মুর্শিদকুলি খাঁ নির্ম্মিত বেগম বাজারের মসজিদ ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মসজিদ ; ইহা দেখিতেও অতি সুন্দর। আরমানি টোলায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত **আরমানি গির্জ্জাটি** সুবৃহৎ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু আর্ম্মেনীয় বাণিজ্যসূত্রে ঢাকায় আগমন করেন। রেল স্টেশনের সম্মুখেই **খাজা আম্বরের মসজিদ ও কূপ** দেখিতে পাওয়া যায় ; খাজা আম্বর শায়েস্তা খাঁর প্রধান খোজা ছিলেন।

স্টেশনের পরই **বিশ্ববিদ্যালয়ের** এলাকা ও রমনা মহাল্লার আরম্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূত-পূর্ব্ব ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। পুরাতন ঢাকা কলেজের বাড়ীতে এখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল অবস্থিত। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ উহার কাছে একটি বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকায় বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও অতি সুন্দর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও কলেজ ভবনগুলি দেখিবার মত। নিকটেই **ঢাকার চিত্রশালা** ; ইহা নায়েব-নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর প্রাসাদের বার-দুয়ারী বা বৈঠকখানায় অবস্থিত ; চিত্রশালার ছাদে এখনও নবাবী আমলের পুরাতন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রশালায় বিক্রমপুর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে এবং ঢাকা ভ্রমণকারীর ইহা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী **ঢাকেশ্বরীর মন্দির** অবস্থিত ; ইহার কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ। কথিত আছে, তাঁহার জননী নির্ব্বাসিতা হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে স্থিত রাণী-ঝি গ্রামে বাস করিতেন ; তাঁহাকে লোকে রাণী-ঝি বলিয়া ডাকিত এবং সেই জন্য গ্রামটির নামও রাণীঝি হয় ; বনমধ্যে এই গ্রামে বল্লাল সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বন-লাল বা বল্লাল হয়। ইহার নিকট লক্ষ্মণ-খোলা গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একটি হাট বসাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের সহিত মহারাজ বল্লালের সম্বন্ধ জনপ্রবাদ দ্বারা সূচিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইলেও উহার পশ্চাদ্ভাগ প্রায় আদি ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে অপর কাহিনী প্রচলিত আছে যে মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার গৃহদেবী শিলাময়ীকে লইয়া প্রথমে ঢাকায় আসেন এবং তথায় ঠিক্ অনুরূপ আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। আসল ও নকল মূর্ত্তিতে ভেদ ধরিবার উপায় ছিল না। মানসিংহ কেদার রায়ের শিলাময়ীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপরটি ঢাকেশ্বরী নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শহরের উত্তরে মালীবাগ নামক স্থানে বারভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত **সিদ্ধেশ্বরী মন্দির** অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি রক্ত চন্দন গাছ আছে। সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী সৌমার বন গোস্বামী স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া কথিত। একবার আজিমপুরার সাধকপ্রবর শাহ্

আলি সাহেব ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি নাকি একটি প্রাচীরে চড়িয়া প্রাচীর শুদ্ধই শাহ্ আলি সাহেবের নিকট আগাইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পার্শ্বে ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত একটি জলাশয় ও কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে; উহা মালীবাগের আখ্ড়া নামে খ্যাত।

শহরের উত্তরে রমনার ময়দানে বুড়া শিব ও রমনার কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বুড়া শিব ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা; কেহ কেহ বলেন ইনি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা ঠিক হইলে বুড়া শিবের বয়স দেড় হাজার বছর হইবে। রমনার কালী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের দশনামী উদাসীন সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে অবস্থিত; ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। মন্দিরটি যে রীতিতে গঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গেও সেরূপ মন্দির বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। বহরের নিকট অধুনালুপ্ত রাজাবাড়ী মঠ ও রাজনগরে রাজ বল্লভের একুশরত্ন মন্দিরে চূড়া এই ধরণের ছিল। কালী মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে। প্রবাদ তাঁহার প্রস্তরাসন খানি লইয়া উমা ও তারা দেবী মিলিয়া ভক্তের সাথে সাথে চলিতেন আর লোকে দেখিত যে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রস্তরখানি শূন্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

রমনার কালীবাড়ীর পশ্চিমে ফুলার রোডের দক্ষিণে একটি পুরাতন শিখ সঙ্গত আছে। প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্গতটির প্রাঙ্গনে বহু শিখ মোহান্তের সমাধি বর্ত্তমান। একটি কক্ষে "গ্রন্থ সাহেব" ও কালো পাথরে অঙ্কিত গুরু নানকের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। প্রাঙ্গনে গুরু নানকের ইন্দারা নামে পরিচিত একটি অষ্টকোণ কূপ আছে; প্রবাদ গুরু নানক একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং এই কূপ হইতে জল পান করিয়াছিলেন এবং এই কারণে ইহার জলের রোগ-শান্তির ক্ষমতা আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গুরুমুখীতে লিখিত কূপের একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে মোহান্ত প্রেমদাস কর্ত্তৃক ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দারাটির একবার সংস্কার হয়। কেহ কেহ বলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঢাকায় আসিয়া এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কেহ বা বলেন ষষ্ঠগুরু হর গোবিন্দের সময়ে নথা সাহেব ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ঢাকায় আগমন করেন এবং তিনিই এই সঙ্গত প্রতিষ্ঠা করেন; সঙ্গতটি নথা সাহেবের সঙ্গত নামেও পরিচিত।

রমনা ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হাজী খাজে সাহাবাজের মস্জিদটি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়; ইহার তিনটি গুম্বজ ও আটটি চূড়া আছে। মসজিদের পার্শ্বে সাহাবাজের সমাধি অবস্থিত। সাহাবাজ কাশ্মীর হইতে আগত বণিক ছিলেন।

রমনার ময়দানের নিকট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গ্রীকদের গির্জ্জা অবস্থিত।

শহরের উত্তর দিকে হুসেনী দালান মুসলমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি চিহ্ন। শিয়া সম্প্রদায়ের এই ইমামবাড়ীটি শাহ্ শুজার শাসন কালে ঢাকার "মীর-ই-বহর" বা নৌবহর পরিদর্শক সৈয়দ মীর মুরাদ কর্ত্তৃক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব্ব এই স্থানে আজও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। হুসেনী দালানের স্থাপত্যরীতি সুন্দর। ঢাকার নায়েব নাজিমগণ হুসেনী দালানের মত ওয়াল্লী থাকিতেন; এক্ষণে ঢাকার নবাবগণ সুন্নী মতাবলম্বী হইলেও ইহার মতওয়াল্লী পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ইহার জন্য বহু অথ ব্যয় করেন।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে ইদ্‌গা নামক মুসলমান-ধর্ম্ম স্থানটি শাহ্ শুজার সময়ে দেওয়ান মীর আবদুল কাশিম কর্ত্তৃক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে বুড়ী গঙ্গার নিকটে **লালবাগ** কেল্লা অবস্থিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুর্গের তোরণ দ্বার, প্রাকার ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে অংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাও দেখিবার মত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজম যখন সুবাদার রূপে অল্পকাল ঢাকায় অবস্থান করেন সেই সময়ে তিনি এই কেল্লা ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। শায়েস্তা খাঁর সময়ে নির্ম্মাণকার্য্য আরও অগ্রসর হয়। দুর্গ মধ্যে একটি জলাশয়ের পশ্চিমে **পরী বিবির মকবরা** নামে একটি মনোরম সমাধি সৌধ আছে। পরী বিবি নবাব শায়েস্তা খাঁর কন্যা ছিলেন। মকবরাটি নির্ম্মাণের জন্য চুণার, গয়া ও জয়পুর হইতে প্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল। সমাধি সৌধে নয়টি কক্ষ আছে এবং এগুলিতে নানা রঙের মর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর কাজ আছে। সৌধের ছাদটির নির্ম্মাণরীতিতে বিশেষত্ব আছে; কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা হিন্দু স্থাপত্যের পরিচায়ক; মকবরার চন্দন কাষ্ঠের দ্বারগুলিও হিন্দু রীতির সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লার ঠিক্ দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি পুরাতন ফটকের বাহিরে সুবৃহৎ লালবাগ মসজিদ অবস্থিত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-সানের পুত্র সম্রাট্ ফরুখ্ শিয়র যখন পিতার প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করেন। লালবাগ কেল্লার নিকটেই বুড়ীগঙ্গা তীরে আজিম-উশ-সান নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ পোস্তাপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল; এখন ইহা বুড়ীগঙ্গা গর্ভে গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বিশপ হিবার পোস্তাপ্রাসাদ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে ইহার স্থাপত্য রীতি মস্কো নগরীর সুবিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদের অনুরূপ এবং ঢাকা শহর তাঁহাকে পদে পদে মস্কোর কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লালবাগে বিদ্রোহীদের সহিত ইংরেজ নাবিকদলের একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইয়াছিল; বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া জামালপুর ময়মনসিংহ অভিমুখে পলায়ন করে।

ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে মিউনিসিপাল এলাকার দুই মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার ও বাঁশবাড়ী নামক স্থানে শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত মনোরম **সাতগুম্বজ মসজিদ** অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে পরী বিবির মকবরার পরেই ইহার স্থান। পার্শ্বেই শায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গুলজার বিবির সমাধিসৌধ।

শহরের নবাবপুর মহাল্লায় বসাকগণের আদিপুরুষ কৃষ্ণদাস মুচছদ্দি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত **নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি** প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বিগ্রহটি পূর্ব্বে বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় কেদার রায়ের ছিল। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। এই মিছিলে বাঁশ ও কাগজ প্রভৃতি দিয়া নির্ম্মিত দুই তিন তল বাটির চেয়ে উচচ "চৌকী" গুলি হইতে নানারূপ কৌশলে পৌরাণিক, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনাবলীর অভিনয় করা হয়। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকীটির শিল্প-কৌশল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু লোক এই মিছিল দেখিতে ঢাকায় আগমন করেন। জন্মাষ্টমীর মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ঢাকার ঝুলনযাত্রা, রাস ও রথযাত্রারও প্রসিদ্ধি আছে।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ, ঠাঠারি বাজারের জয়কালী মন্দির ও পঞ্চরত্ন মঠ ও এক্রামপুরের বীরভদ্রাশ্রমও উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব-প্রধান নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ধর্ম্মপ্রচারার্থ ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে বীরভদ্রাশ্রম স্থাপিত হয়।

মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকায়ও বহুদিন হইতে খাজা খিজিরের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতি বারে ব্যারা বা বেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকাও বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানেও ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকগণের কুঠি ছিল। পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে ঢাকায় আসেন এবং সঙ্গতটোলায় তাঁহাদের কুঠি ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। ওলন্দাজেরা প্রথমে দেশীয় গোমস্তা পাঠাইয়া মাল খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪২ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন ওলন্দাজ ঢাকার কুঠির কর্ত্তা হইয়া আসেন। এখন যেখানে ঢাকায় মিট্‌ফোর্ড্‌ হাঁসপাতাল তৈয়ারী হইয়াছে পূর্ব্বে সেইস্থানে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কুঠি তেজগ্রামে ছিল কিন্তু পরে বুড়ীগঙ্গার নিকটে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের পর ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে বর্ত্তমান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে নূতন কুঠি তৈয়ারী হয়। ঢাকায় ঈস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ওলন্দাজেরা ইহা ইংরেজদের ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; ঢাকা নগরে যে স্থানে ফরাসীদের কুঠি ছিল সেই স্থান এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। ফরাসীদিগের কুঠিটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'আহ্‌সন মঞ্জিল' নামক বিখ্যাত প্রাসাদ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক কালে বসাকগণ ঢাকার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের পুরাতন ব্যবসায় হইতে বাহিরের লোক তাঁহাদের হটাইতে পারেন নাই। ঢাকায় পাট ও কাঁচা চামড়ার কারবার বেশ বড়। বহুকাল হইতে এখানে কমদামী সাবান প্রস্তুত হইতেছে। একটি কাঁচের কারখানাও এখানে আছে।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি পুরাতন। প্লিনির লেখা হইতে জানা যায় প্রাচীন রোমের মেয়েরা ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এরিয়ানের "পেরিপ্লাস অব দি ঈরিথ্রিয়ন সী" নামক গ্রন্থেও মসলিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা, তিতর্দ্দি প্রভৃতি স্থানে সূক্ষ্মতম মসলিন প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই মসলিন বুনিবার প্রশস্ত সময় ছিল। মসলিন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে মাদ্রাজ প্রদেশের মসলিপত্তন বন্দর হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ এই বস্ত্র কিনিয়া লইয়া যাইতেন এবং মসলিপত্তন হইতে মসলিন নামের উৎপত্তি। অপর মতে তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাল হইতে এই বস্ত্র রপ্তানী হইত। কিন্তু পরে পর্ত্তুগীজ জল দস্যুগণের অত্যাচারে বা এরূপ কোনও কারণে এই ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন তুরস্কের মোসুল নগরীতে এই বস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয় এবং তথাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র মসুলিন নামে পরিচিত হয়।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসুলিন বস্ত্র ইউরোপের সর্ব্বত্র রপ্তানী হইত। ভ্রমণকারী ট্রাভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ইরাণের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে শাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসুলিন একটি অতি ক্ষুদ্র নারিকেল খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মসুলিন জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দ্বারা এদিকে ওদিকে নেওয়া যাইত; এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মসুলিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০৲। ৫০০৲ টাকা বিক্রয় হইত। কথিত আছে সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের এক কন্যা সাত ফের দিয়া আবরোয়ান মসুলিন পরিধান করিয়া পিতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইলে নির্লজ্জা বলিয়া ভৎর্সিতা হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও মসুলিন প্রস্তুতের এক পাউণ্ড ওজনের এক ফেটি সূতা মাপিয়া লম্বায় ২৫০ মাইল হইয়াছিল। সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর

করিতেন। সম্রাট্ শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব ঢাকাই মস্‌লিন দিল্লীর অন্তঃপুরে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে মস্‌লিন ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে যাইতে না পারে, সে জন্য রাজকীয় আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকার মস্‌লিনের নানা নাম ছিল, যথা ঝুনা (হিন্দি শব্দ, অর্থ—সূক্ষ্ম—ইহা মাকড়সার জালের মত ছিল), সব্‌নম্ (ইরানীয় শব্দ, অথ সান্ধ্য শিশির—সিক্ত করিয়া ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না, শিশির বলিয়া ভ্রম হইত), আবরোয়ান (ইরাণীয় শব্দ, অর্থ জল স্রোত, জলের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যাইত), সঙ্গতি, সরবতি, রং, সরকার আলি আলবাল্লে, তনজের, তরন্দাম, নয়নসুক, সরবন্দ, কুমসী, বদন খাস, মলমল খাস, খাসা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাসা নাম জঙ্গলখাসা) ইত্যাদি। নানা প্রকার ডুরে কাপড় ছিল; তাহাদের নাম, রাজকোট, কাগজাহি, পাদশাহীদার, কলাপাত প্রভৃতি। বিভিন্ন রঙের মস্‌লিন চারখানা নামে অভিহিত হইত; ইহাও নানারূপ ছিল, যথা নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কবুতরখোপা, পাছাদার প্রভৃতি। বুটা ও ফুলতোলা মস্‌লিন কসিদা নামে অভিহিত, ইহাও নানা প্রকারের, যথা কাটা-উরমী, নৌবত্তি, আজিজুল্লা, দোছাক প্রভৃতি। বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মসলিন বা জামদানীও নানা প্রকারের, যথা তোরাদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলীজাল, ছড়িয়াল, সাবুরগা ইত্যাদি। মস্‌লিন ছাড়া বাফতা নামে একপ্রকার সুন্দর মোটা গাত্র-বস্ত্রও নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা, হাম্মাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নানা দেশের জন্য ঢাকায় ২৮,৫০,০০০ টাকার মস্‌লিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও বাংলার সর্ব্বত্র ঢাকাই শাড়ী ও ধুতির বিশেষ আদর আছে।

মসলিনের জন্য প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের আগে সূক্ষ্ম সুতা কাটার রীতি ছিল। চরকার দ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা সুতা ও ডলনকাঠি বা টাকুর সাহায্যে সূক্ষ্ম সুতা কাটা হইত। খাদি আন্দোলনের পর হইতে আমাদের আদিম কালের টাকু বা টেকো তক্‌লি নামে পরিচিত হইতেছে। ইহা সত্যই দুঃখের কথা।

মস্‌লিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ঢাকার এখনও নাম আছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র ধুইলে সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হইলে "কাঁটা করিয়া" ইহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়। ঢাকা ভিন্ন অন্য কোথাও এই পদ্ধতি চলিত নাই বলিয়া আজও অনেকে ঢাকাই শাড়ী ঢাকায় ধুইতে পাঠান। ঢাকার কুমদীগরগণ শঙ্খ দ্বারা বস্ত্রাদি মার্জ্জনা করিয়া উজ্জ্বল ও মসৃণ করিতে সুদক্ষ; ঢাকাই শঙ্খ-করা বস্ত্রের খ্যাতি আছে। ঢাকার রিফুগরদিগেরও সূক্ষ্মকার্য্যের জন্য নাম আছে।

ঢাকায় মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রে রেশম ও জরির কাজ অতি সুন্দর হইয়া থাকে; এই কাজ জরদজী নামে খ্যাত।

ঢাকায় রূপার তারের কাজ (ফিলিগ্রী) শঙ্খশিল্প ও ঝিনুকের বোতাম, মাথার ফুল, ঘড়ির চেন প্রভৃতির খ্যাতি আছে। শাঁখের কাজের জন্য মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল মলয়দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পরিমাণে সামুদ্রিক শঙ্খ আনিতে হয়; তিনকৌড়ী, পাটি, জাহাজী, ধলা, বাড়বাকী, সুরতী ও আলাটিলা এই কয় প্রকার শঙ্খ উৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ আমদানী হয় ও পাচ লক্ষ টাকার কারুকার্য্যখচিত শাখা, চুড়ী, বালা, মালা, কানের ফুল, আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেন প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঢাকার অমৃতী, মালাই, পণীর ও নারানখাদা ও বাকরখানি রুটির খ্যাতি আছে।

নদী-বহুল ঢাকা অঞ্চলে নানাপ্রকারের নৌকা দৃষ্ট হয়, যথা—কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, নাওধুবী, সারেঙ্গা, কুমারিয়া, পলওয়ার, ডিঙ্গী, পানসী প্রভৃতি।

তালতলা—ঢাকা হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রূপগঞ্জ থানা অবস্থিত। এই থানার মধ্যে নিকটে লাক্ষ্যা নদীর তীরে ডাঙ্গাবাজার গ্রামের নিকট তালতলা গ্রামে সাধকপ্রবর কথুনাথের সমাধি ও উপাসনা-মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থান প্রথমে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, কথুনাথ আসিয়া গুরুদত্ত শিঙ্গা ধ্বনি করিতে থাকিলে জঙ্গলের পশুগুলি অন্যত্র চলিয়া যায় এবং ক্রমে লোকের বসতি হয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে শিলমন্দি গ্রামে কথুনাথের জন্ম হয়। তিনি জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং যৌবনে মাতা ও পত্নীকে ফেলিয়া ধর্ম্ম সাধনার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া শ্রীহট্ট জেলায় বিথঙ্গলে রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়েরএ আখড়ায় উপস্থিত হন। কথুনাথকে পরীক্ষার্থ রামকৃষ্ণ পাদোদক আনিবেন বলিয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নয় দিন পরে বাহির হইয়া দেখেন কথুনাথ একই ভাবে দণ্ডায়মান। তখন প্রীত হইয়া রামকৃষ্ণ কথুনাথকে দীক্ষা দান করেন। কথুনাথ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তালতলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বাছিলা—ঢাকা হইতে বুড়ীগঙ্গা তীরে উত্তর-পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। মাঘী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে এখানে ঢাকা হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। "ইহা কুশাগাড়ার বান্নি" (বারুণী) নামে খ্যাত। প্রবাদ প্রাচীনকালে পাচজন মুনি এই স্থান কঠোর তপস্যা করিয়া 'কুশা' গাড়িয়া বা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

কলাকোপা—ঢাকা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে নবাবগঞ্জ থানা। এই থানার অন্তর্গত কলাকোপা গ্রামে মহাত্মা দাতা খেলারাম নির্ম্মিত নবরত্ন মন্দির ও ক্ষেপা রাণীর আখড়া ও বলাই বাউলের আখড়া নামে বাউল-সম্প্রদায়ের দুইটি আখড়া আছে। ধর্ম্মসাধনার জন্য ক্ষেপা রাণী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে সুন্দর মাটির জিনিস তৈয়ারী হয়। তেল রাখিবার জন্য এখানকার মাটির মটকা গুলিতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত তেল ধরে।

মীরপুর—ঢাকা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে উচচ ভূমির উপর অবস্থিত মীরপুরের দৃশ্য সুন্দর। প্রসিদ্ধ আউলিয়া হজরৎ শাহ আলি সাহেবের দরগাহ এখানে অবস্থিত। কথিত আছে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বোগদাদের রাজকুমার হজরৎ শাহ আলি চারজন শিষ্য সহ এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। শিষ্যগণকে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া দেড় বছর অনশন ব্রত লইয়া তিনি মসজিদে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সাধনায় মগ্ন হন। দেড় বছরের একদিন মাত্র বাকি থাকিতে শিষ্যগণ রুদ্ধদ্বার মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া দেখিলেন আউলিয়া তথায় নাই এবং আগুনের উপর একটি পাত্রে রক্ত ফুটিতেছে। কিছু পরেই তাঁহারা গুরুর কণ্ঠস্বরে আকাশ বাণী শুনিলেন এবং পাত্রস্থ রক্ত সমাহিত করিতে আদিষ্ট হইলেন। সেইমত তাঁহারা রক্ত সমাহিত করিলেন। তদবধি এই স্থান বিশেষ পূত বলিয়া গণ্য হয় এবং সহস্র সহস্র নর নারী এই

সমাধি দর্শনে আসেন। হজরৎ শাহ্ আলি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, কিন্তু তিনি যে মস্‌জিদে সমাহিত উহা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মীরপুরের নিকট স্থানে স্থানে তুরাগ নদীতে ঝিনুকের মধ্যে ছোট ছোট মুক্তা পাওয়া যায়।

সাভার—ঢাকা হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্ব্বে এই স্থানে সম্ভার বা সম্ভাগ নামে একটি রাজ্য ছিল বলিয়া কথিত; পরে ইহা সর্ব্বেশ্বর নগরী নামে পরিচিত হয়। প্রবাদ রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে এই স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সাভারের পূর্ব্বদিকে বলীমোহর নামক স্থানে তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার দুর্গটি এখন "কোঠা বাড়ী" নামে একটি মৃত্তিকা-স্তূপ; ইহার মধ্যভাগের একটি গহ্বর হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া সৈন্যগণ নিরাপদে যুদ্ধ করিত। ইহা আধুনিক কালের ট্রেঞ্চের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী কর্ণাবতী ও ফুলেশ্বরীর নাম হইতে নিকটস্থ কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া গ্রামের নাম হয় ও তাঁহার দুই কন্যা উদুনা ও পদুনার সহিত পেটিকা নগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। রংপুর ও কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। কর্ণপাড়ার রাজার "তাম্বুল বাড়ী" বলিয়া পরিচিত স্তূপটি একটি বিরাট চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ৫০টি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, উহা আজও "সাড়ে বার গণ্ডা" নামে খ্যাত। তিনি ধর্ম্মের জন্য স্বীয় পুত্রকে পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলের জঙ্গলমধ্যে খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীর কারুকার্য্য খচিত বহু পাথর ও ইটের টুকরা দৃষ্ট হয়। সাভার প্রভৃতি গ্রামে এই কবিতাটি চলিত আছে;

বংশাবতী পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥

ধামরাই—সাভার হইতে ৪ মাইল ও ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বংশী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন স্থান। পুরাতন কাগজ পত্রে ধামরাই ধর্ম্মরাজিয়া নামে উল্লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে সম্রাট অশোক-প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকাস্তম্ভের একটি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি বৃহৎ কারুকার্য্যখচিত রথ আছে; ইহা এবং এখানকার যশোমাধব বিগ্রহ মাধবপুরের রাজা যশোপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত। ধামরাইএর ৬ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান গাজীবাড়ী পূর্ব্বে মাধবপুর নামে পরিচিত ছিল। প্রবাদ রাজা যশোপাল একবার একদন্ত শ্বেতহস্তী চড়িয়া ভ্রমণকালে ধামরাই গ্রামের এক উচচ ঢিবির সম্মুখে আসিলে তাঁহার হস্তী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না এবং পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। তখন রাজাদেশে স্থানটি খনিত হইলে মাধবের মূর্ত্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়। যশোপালের নাম হইতে দেবতা যশোমাধব নামে পরিচিত হন। আরও প্রবাদ পুরীধামের প্রথম জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া যশোমাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। রথের সময়ে এখানে বৃহৎ মেলা ও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন কিছু কিছু দ্রব্যাদি দৃষ্ট হয়। যশোমাধবের ভোগ বিনা লবণে প্রস্তুত হয়। যশোমাধব ব্যতীত ধামরাই গ্রামের আদ্যাশক্তি, বাসুদেব ও রাধানাথেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। রাধানাথের নিকটে অনেকে চক্ষুঃপীড়ার শান্তির

জন্য মানসিক করিয়া থাকেন। ধামরাই গ্রামে চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী ও পরদিন মদন-চতুর্দ্দশী তিথিতে মদনোৎসব ও কামদেবের পূজা হইয়া থাকে; একটি কলাগাছ পুতিয়া এবং বহু লোক মিলিয়া ঢোল বাজাইয়া সুর করিয়া ছড়া আবৃত্তি করিয়া কামদেবের পূজা করা হয়। ছড়াটির প্রথম চার ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

এই থলিতে আয়রে কামা এই থলিতে আয়।
ধবল পাঁঠা দিমু তোরে এই থলিতে আয়।।
লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলিতে আয়।
ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই থলিতে আয়।।

এ অঞ্চলে শূকর বলি দিয়া বনদুর্গা পূজার প্রথা আছে। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ যুগের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। ধামরাই সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য খ্যাত; এই স্থানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীদের একটি কুঠি ছিল।

বাজাসন—সাভার হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ঢাকা হইতে ২১ মাইল দূরে নান্নার ও সুয়াপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাজাসনের ভিটা নামে যে মৃত্তিকা স্তূপটি দৃষ্ট হয়, অনেকের মতে উহা সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া স্বনামধন্য দীপঙ্কর অতীশ এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনায় বজ্রাসন নামে পরিচিত এক আসন আছে।

মাণিকগঞ্জ—ঢাকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে; ইহা ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। ইহার দক্ষিণে শিববাড়ী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও মনোহারিণী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। যোগী জাতীয় ব্যক্তিগণ এই শিবের পূজারীর কাজ করেন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বড় মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত খাবাশপুর গ্রামে নিম কাঠের নিমাইচাঁদ মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চৈত্র মাসে বিগ্রহটি লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও ১লা বৈশাখ একটি মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ হইতে ঠিক ১৪ মাইল পশ্চিমে পদ্মা ও যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলের নিকটে অবস্থিত আড়িচা স্টীমার স্টেশন। আসাম-সুন্দরবন স্টীমার পথে উত্তর দিকে গোয়ালন্দের ঠিক পরের স্টেশন। এই পথেও মাণিকগঞ্জ আসা যায়। আড়িচার ঠিক্ উত্তরেই তেওতার রায়বংশীয় জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। পদ্মা ও যমুনার মোহানা এ অঞ্চলে বাইশ কোদালিয়ার মোহানা নামে খ্যাত। কথিত আছে একবার বন্যার পর একটি কৃষক পরিবারের ২২টি লোক মিলিয়া জল নিবারণের জন্য জমি কাটিয়া পদ্মা ও যমুনার দিকে জলের পথ করিয়া দেয়; ক্রমে ২।৩ বৎসরে এই কাটা জলপথ দুটি দিয়া পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়। ইহা হইতে বাইশ কোদালিয়া মোহানা নামের উৎপত্তি হয়। এই গ্রাম্য কাহিনীতে আধুনিক কালে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন ও পদ্মার সহিত মিলনের কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তেজগাঁও—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১৪ মাইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পর্তুগীজ গির্জ্জা এখানে আছে; গির্জ্জাটি ব্যাণ্ডেলের প্রসিদ্ধ গির্জ্জার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

স্থানে ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও দিনেমারদের কুঠি ছিল। তেজগাঁওএ একটি বিস্তৃত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ৩৭ ফুট উচ্চ একটি পুরাতন ইষ্টক-স্তম্ভ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও মতে ইহা মগদিগের বিজয়স্তম্ভ, অপর মতে ইহা একটি সমাধি-স্তম্ভ। ইহার অনতিদূরে মণিপুর গ্রাম। এই গ্রামে মণিপুর রাজবংশের দেবেন্দ্র সিংহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর নজরবন্দী ছিলেন ; এই জন্য গ্রামটির নাম মণিপুর হইয়াছে।

টঙ্গী জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ২৩ মাইল দূর। ভৈরববাজার জংশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে। স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে টঙ্গী নদীর উপর মীর জুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পুরাতন সেতু আছে।

জয়দেবপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩০ মাইল। ইহা প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণার জমিদার বংশের নিবাসভূমি। ভাওয়াল মোকর্দ্দমার জন্য ভাওয়ালের নাম আজকাল সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞাত। এই বংশের বিখ্যাত ও বদান্য জমিদার কালীনারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ও মুক্তহস্ত বলিয়া পরিচিত। ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শ্মশানের স্মৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রসিদ্ধ পল্লী কবি গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময়ে এই জমিদারীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বারভূঁইয়ার অন্যতম ফজল গাজী ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ফজলগাজী প্রথমে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির একজন সহকারী ছিলেন। ফজল গাজীর বংশীয়গণ প্রথমে কালীগঞ্জে ও পরে জয়দেবপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে বাস করিতেন ; সেই জন্য মাধবপুর পরে গাজীবাড়ী নামে পরিচিত হয়। এই বংশের দৌলত গাজী মুঘল সরকারে ঠিক মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুঘল সরকার তাঁহাদের কাছ হইতে জমিদারী বর্ত্তমান বংশের হাতে অর্পণ করেন।

জয়দেবপুর স্টেশন হইতে প্রায় ২৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার মীর্জাপুর গ্রাম ও থানা। টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে ইহা ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মীর্জাপুরের ২ মাইল দক্ষিণে কাঁটালিয়া গ্রামে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবংশীয় কবি ভবানী প্রসাদ রায় জন্মান্ধ হইয়াও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মীর্জাপুরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শাকাসার গ্রামে ৬ ফুট্ উচ্চ একটি অতি পুরাতন অষ্টকোণ প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহা এখন সিদ্ধি মাধব নামে পূজা পাইতেছে ; হিন্দুগণ ইহার নিকটে বন্য বরাহ ও মুসলমানগণ কুক্কুট বলি দিয়া থাকেন। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; অস্পষ্ট যাহা দেখা যায় তাহা হইতে মুদ্রাসীন ধ্যানস্থ মূর্ত্তি—মস্তকে কিরীট ও কর্ণে কুণ্ডল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন এগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি। "ঢাকার ইতিহাস" রচয়িতা যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভারতের অন্য স্থানে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে এবং শাকাসার হইতে ধামরাই বহুদুর নয় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে ইহা ধামরাইএর ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভ হওয়া অসম্ভব নয়।

ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরভাগ হইতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মধুপুর জঙ্গলের পর্ব্বাংশ। পশ্চিমাংশটি কাশিমপুরের গড় বা জঙ্গল নামে খ্যাত।

গজালি গাছের প্রাধান্য হেতু এই বনভূমি গড়গজালি নামেও অভিহিত হয়। এই বনে বাঘের অভাব নাই। পূর্বে এই বনে হাতী পাওয়া যাইত। এই জঙ্গলে ভালো মধু ও মোম পাওয়া যায়।

ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত সুবৃহৎ বেলাই বিলের বর্গফল ৮ বগ মাইল; পূর্বে ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূস্বামী খট্টেশ্বর ঘোষ ইহা হইতে ৮০টি খাল কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোক সঙ্গীতেও এই ঘটনা স্থান পাইয়াছে। যথা,—

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্করিণী কাটিল।
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল।
ভাই অদ্ভুত কাহিনী॥

ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত পর্তুগীজদের একটি গির্জা আছে।

রাজেন্দ্রপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩৭ মাইল। ভাওয়ালের জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে জ্বালানি কাঠ চালান যায়। স্টেশনের নিকটেই রাজাবাড়ী নামক স্থানে চণ্ডাল রাজাদের বলিয়া কথিত একটি প্রাসাদ ও দুর্গ প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামে চণ্ডালরাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে অনুমান করেন ইহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহাদের প্রতাপান্বিতা ভগিণী মোগ্গী প্রতিষ্ঠিত "মোগ্গীরমঠ" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্টেশন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে বোয়ালী গ্রাম; তথা হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকুরাই গ্রামে ঢোলসমুদ্র নামে একটি বৃহৎ ও গভীর দীঘি আছে। কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে রাজা উহার গভীরতা দেখিবার জন্য একজন ঢুলীকে দীঘির তলে নামাইয়া দেন। কিন্তু উহা এত গভীর যে ঢুলী বহু জোরে ঢোল বাজাইলেও তাহার আওয়াজ দীঘির পাড়ে পোছায় নাই; সেজন্য ইহার নাম হয় ঢোলসমুদ্র। ঢোলসমুদ্রের পাড়ে মঠের চালা নামে একটি প্রকাণ্ড উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়; ইহা একটি বৌদ্ধচৈত্যের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ঢোলসমুদ্রের নিকটেই কোটামণির পুকুর ও পাল বংশীয় বলিয়া কথিত যশোপাল নামে একজন স্থানীয় রাজার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অবস্থিত।

স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে বানার বা লাক্ষ্যা নদীর তীরে কাপাসিয়া একটি পুরাতন স্থান; এখানে বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাপাস তুলা উৎপন্ন হইত। কাপাসিয়ার নিকট নদীর উপর দুর দুরিয়া গ্রামে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ গড়ের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত; ইহার বহিঃপ্রাকার সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই মাইল। গড়ের অপর পারেও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় এই স্থানে পূর্বে একটি বড় নগর ছিল। মুসলমান আক্রমণের সময়ে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে গড়টি রাণী ভবানী নামে

স্থানীয় একজন রাণী কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত হয়। এই দুর্গ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে বানার নদী তীরে একডালা নামক স্থানেও একটি দুর্গ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ মনে করেন ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একডালা দুর্গ। রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-মালদহ-কাটিহার শাখার আদিনা স্টেশন দ্রষ্টব্য।

শ্রীপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে ভাওয়ালের জঙ্গল মধ্যে দীঘ্লির ছিট্ বা সিংহের দীঘি নামক স্থানে শিশুপাল নামক একজন স্থানীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী শৈলাট নামক স্থানেও তাঁহার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আছে।

সাতখামাইর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে যে স্থানে বানার নদী বাহির হইয়াছে সেই স্থানে এগারসিন্ধু নামক গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সোনারগাঁও রাজ্যের উত্তর সীমার ঘাটি ছিল। প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া রাজা ঈশা খাঁ মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নিজ রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া এই দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুঘল আক্রমণের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হন। কথিত আছে মুঘল বাহিনী বানার কূলে ছাউনী স্থাপন করিলে ঈশা খাঁ বানার হইতে ১৫টি খাল কাটিয়া হঠাৎ জলস্রোতে শত্রুপক্ষকে ভাসাইয়া দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহার বহু পরে মহারাজ মানসিংহের সহিত ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়। (নারায়ণগঞ্জ দ্রষ্টব্য)।

ময়মনসিংহ জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৮৬ মাইল দূর। কলিকাতা হইতে রেলপথে সিরাজগঞ্জ ঘাট, তথা হইতে স্টীমারে জগন্নাথগঞ্জ এবং জগন্নাথগঞ্জ হইতে ট্রেণে ময়মনসিংহ আসিবার পথই সুবিধার। আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা আখাউড়া জংশন হইতে এই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। ময়মনসিংহ একটি নূতন শহর। ইহার পার্শ্বস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বে উহার প্রধান খাত ছিল, এখন প্রায় মজিয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়। অশোকাষ্টমীর সময়ে এই স্থানেও বহুলোক ব্রহ্মপুত্র স্নান করেন। ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রধান লাইনের ঈশ্বরদি স্টেশন দ্রষ্টব্য। ময়মনসিংহ জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা এবং এই জেলায় বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। পরলোকগত দেশনায়ক আনন্দমোহন বসুর নামে ময়মনসিংহ শহরে সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বালকদের বিদ্যালয় ছাড়া বালিকাদের জন্য এস্থানে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয় আছে।

ময়মনসিংহ শহর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে মুক্তাগাছায় আচার্য্য চৌধুরী উপাধিধারী প্রসিদ্ধ জমিদারগণের বাস।

সিংহজানি জংশন—নারায়ণগঞ্জ জংশন হইতে ১১৯ মাইল দূর। এই স্টেশন হইতে একটি শাখা নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার কূলে প্রায় ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে রেলপথে সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া স্টীমারে জগন্নাথগঞ্জে আসিয়া ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম প্রভৃতি যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে হয়। জগন্নাথগঞ্জের আগের স্টেশন সরিষাবাড়ী

পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। সিরাজগঞ্জঘাট-জগন্নাথগঞ্জ স্টীমার পথে ময়মনসিংহ জেলায় পিংনায় একটি স্টীমার স্টেশন আছে। ইহাও একটি পাটের বড় কেন্দ্র।

সিংহজানি স্টেশনে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমা অবস্থিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে জামালপুরে একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাসের কর্ম্মচারিগণের সমাধিস্থল এখনও জামালপুর শহরের একপ্রান্তে বিদ্যমান আছে। সন্ন্যাসীরা আসাম হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ জেলায় ভীষণ উপদ্রব করিত বলিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সেনানিবাসটি স্থাপিত হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহের বৎসরে ইহা উঠিয়া যায়। ৺নন্দকৃষ্ণ বসু যখন জামালপুর মহকুমার হাকিম তখন হইতে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার চেষ্টায় এখানে একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই মেলা নিয়মিত ভাবে এখনও প্রতিবৎসর হইয়া থাকে।

সিংহজানি বা জামালপুর হইতে ৯ মাইল উত্তরে **শেরপুর** শহর অবস্থিত। এখানে বৈদ্যবংশীয় কয়েকটি জমিদারের বাস আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শেরপুর হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গড়-জরিপা নামক স্থানে একটি বৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ৪৫ ফুট্ উচ্চ ও ৭৫ ফুট্ চওড়া ইহার পর ৭টি প্রাচীর ছিল। ইহা কোচ বংশীয় দলিপ সামন্ত কর্ত্তৃক গারোদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমানগণের অধিকারে আসে।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে মধুপুর গ্রামে পুঁটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত একটি মদন গোপাল বিগ্রহ আছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ বরাবর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়ে এই স্থানে একদল সন্ন্যাসীর কেন্দ্র ছিল।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা অবস্থিত। আসাম-সুন্দরবন স্টীমার পথের পোড়াবাড়ী স্টেশন ব্রহ্মপুত্র তীরে এখান হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে। টাঙ্গাইলের সুন্দর রঙীন শাড়ী বাংলার সর্ব্বত্র পরিচিত। টাঙ্গাইলের ২ মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কাগমারী জমিদারগণের বাসস্থান সন্তোষ গ্রাম অবস্থিত। টাঙ্গাইলের ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে করটিয়া গ্রামে পানি বংশীয় প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারগণের বাস। এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। টাঙ্গাইল হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে দিলদুয়ার গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ গজনবীবংশীয় জমিদারগণের বাস। টাঙ্গাইলের ৭ মাইল দক্ষিণে এলাশিন একটি প্রসিদ্ধ পাটের গঞ্জ। ইহার নিকট হইতেই ধলেশ্বরী নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে।

বাহাদুরাবাদ—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৪৪ মাইল দূর। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত ইহা এই শাখার শেষ স্টেশন। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের নিজ খেয়া জাহাজে

অপর তীরে তিস্তামুখ ঘাট ও ফুলছড়ি পর্য্যন্ত যাত্রী ও মালগাড়ী প্রভৃতি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। বাহাদুরাবাদের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের কূলে গারোপাহাড়ের পাদদেশে রংপুর জেলার রৌমারী বন্দর ও নিকটে গোয়ালপাড়া জেলার মাণিকের চর নামক গঞ্জ অবস্থিত। মাণিকের চর হইয়া গারোপাহাড়ের প্রধান শহর তুরা যাইতে হয়।
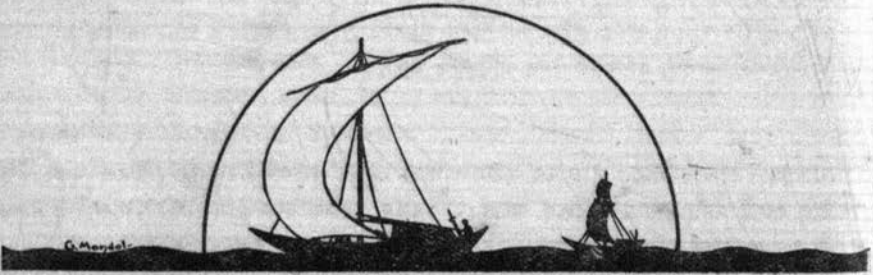
পূর্ব্ব ভারত রেলপথে বাংলাদেশ।

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি নামক একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খুলেন। ইহাই পূর্ব্ব ভারত রেলপথের সূচনা। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই রেল পথকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আর নূতন রেলপথ খোলা হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতে প্রেরিত সৈন্যগণকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া অতঃপর পদব্রজে বা অন্য যান বাহনের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পেঁছিতে হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথকে আসানসোলের নিকটবর্ত্তী সিয়ারসোল পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। ক্রমশঃ এই রেলপথ অগ্রসর হইয়া পাটনা, গয়া, মোগলসরাই, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ ও কানপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সরকার এই রেলপথ কিনিয়া লন এবং ইহার পরিচালনার ভার একটি নবগঠিত কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করেন। সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে কোম্পানি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রেলপথের পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সরকার এই রেলপথের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "আউধ-রোহিলখণ্ড" নামক রেল পথটি সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রেলপথ মোগলসরাই হইতে সুরু করিয়া বেণারস, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, নিমসার, বেরিলী, সাজাহানপুর ও মোরাদাবাদ হইয়া হরিদ্বার ও সাহারাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব ভারত রেলপথ সরকারী পরিচালনায় আসিবার পর উক্ত বৎসরে ১লা জুলাই হইতে "আউধ-রোহিলখণ্ড" রেলপথকে উহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ভারত রেলপথ বলিতে এই উভয় রেলপথের সমষ্টিকে বুঝায়। এই রেলপথের বিস্তৃত চারি হাজার মাইলেরও উপর। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের বহু স্থান এই রেলপথের দ্বারা সেবিত। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র এই রেলপথের উপর বা নিকটে অবস্থিত।

বাংলা দেশের হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত। এই সকল জেলার প্রসিদ্ধ স্থান এবং এই রেলপথের উপর অবস্থিত অধুনা বিহারের অন্তর্গত মানভূম প্রভৃতি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল অথবা সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে তাহাদের বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

(ক) হাওড়া—বর্দ্ধমান—আসানসোল—সীতারামপুর (প্রধান লাইন)

লিলুয়া—হাওড়া হইতে তিন মাইল দূর। এখানে পূর্ব্ব ভারত রেলপথের একটি ওয়র্কশপ্ বা গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এই কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে। লিলুয়ার রেল-উপনিবেশটি অতি সুন্দর। এখানে বিদ্যালয়, উদ্যান, প্রমোদাগার, ভজনালয়, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। লিলুয়ার অনাথ আশ্রম ও গো-শালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান।

* বেলুড়—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে গঙ্গার তীরে জগৎ বিখ্যাত বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, শ্রীসারদামণি দেবী বা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাতা ঠাকুরাণীর মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক সমাগম হয়। সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রস্তর মণ্ডিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে পরমহংসদেবের মর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তির নিত্য পূজা হইতেছে। এই মন্দিরটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় এই মন্দির নির্ম্মাণের সুযোগ ঘটে নাই। দুইজন মহীয়সী মার্কিনী মহিলার প্রভূত অর্থ সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন আজ বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এরূপ বহুমূল্য ও বৃহৎ মন্দির বাংলা দেশে আর নাই। রামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে প্রত্যহ বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বেলুড় মঠে মহাসমারোহে পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

বালী—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র পল্লী। কয়েক বৎসর হইল এখানে গঙ্গার উপর এক প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সেতুটির উভয় পার্শ্বে গাড়ী-ঘোড়া, মোটরকার ও পদচারীদের জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়েলিংডনের নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ওয়েলিংডন সেতু"। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের কয়েকটি যাত্রী-গাড়ী এই সেতুর উপর দিয়া শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী এই সেতুর ঠিক পার্শ্বে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত।

বালীর দক্ষিণে ঘুসুড়ীতে ভোটবাগান নামে তিব্বতীয়দের একটি মন্দির আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়া যুদ্ধের পর তিব্বতের তাশীলামার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইলে, তাশীলামার অনুরোধে ভাগীরথী কূলে বৌদ্ধদিগের জন্য ওয়ারেন্ হেস্‌টিংস এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বাংলা দেশের মন্দিরের মত ইহার ছাদ ও মন্দির গাত্রে তিব্বতীয় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। তাশীলামা মন্দিরের জন্য বহু শাস্ত্র গ্রন্থ ও পূজার উপকরণ পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরাণগিরি গোঁসাই নামক শৈব সন্ন্যাসীকে মোহান্ত নিযুক্ত করেন। মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তি দুই আছে। তাশীলামা চীন সম্রাটের দরবারে গমন কালে পুরাণগিরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

বালী গ্রামে পূর্ব্বে এক শ্রেণীর দেশীয় কাগজ প্রস্তুত হইত; উহা "বালীর কাগজ" নামে বিখ্যাত ছিল।

বালীতে "কল্যাণেশ্বর" নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবের মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। পূর্ব্বে এখানে অনেকগুলি টোল ছিল এবং ছাপাখানার যুগের পূর্ব্বে এখানকার আচার্য্যরা যে পঞ্জিকা বাহির করিতেন তাহার বেশ আদর ছিল।

উত্তরপাড়া—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। বালীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি খাল আছে, উহাই হাওড়া জেলার শেষ সীমা। এই খালের অপর পারস্থিত উত্তরপাড়া গ্রাম হইতে হুগলী জেলার আরম্ভ। উত্তরপাড়া পূর্ব্বে বালী গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। কালক্রমে ইহা স্বতন্ত্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তরপাড়া একটি সুদৃশ্য শহর। এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ-সমন্বিত একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। ইতালীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্ম্মিত গ্রন্থাগার ভবনটি ভাগীরথী হইতে সুন্দর দেখায়। এখানকার মুখোপাধ্যায় বংশ বাংলার প্রসিদ্ধ জমিদারগণের অন্যতম।

কোন্নগর—হাওড়া হইতে ৯ মাইল দূর। ইহাও গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্লী। বৃটিশ আমলের পূর্ব্বে এখানে দিনেমারগণের একটি ডক্ ছিল। বর্ত্তমানে উহার চিহ্ন নাই। এখানে গঙ্গাতীরে দ্বাদশ মন্দির সংযুক্ত একটি ঘাট আছে; কলিকাতার হাটখোলা দত্তবংশের হরসুন্দর দত্ত উহার প্রতিষ্ঠাতা। জগৎ বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক নিবাস কোন্নগরে। বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শিবচন্দ্র দেবের জন্মস্থানও কোন্নগর। শিবচন্দ্রের জন্যই কোন্নগরের যাহা কিছু উন্নতি। তাঁহার চেষ্টায় এখানে ইংরেজী স্কুল, রেল স্টেশন, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ব্রাহ্মসমাজ ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং "শিশু পালন" ও "অধ্যাত্ম বিজ্ঞান" নামে দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ "পদ্যপাঠ" সঙ্কলয়িতা সুকবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরের অধিবাসী ছিলেন।

প্রতিবৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন কোন্নগরে মহাসমারোহে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা হয় এবং উহা দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

রিষড়া—হাওড়া হইতে ১১ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্বে একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" এই স্থানের উল্লেখ আছে। এই স্থানে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের একটি বাগান বাড়ী ছিল, উহার নাম ছিল "রিষড়া হাউস"। উহা এখন "হেষ্টিং মিল"এ পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরের নিকট যে আম্রবীথিকা রহিয়াছে, কথিত আছে, উহা হেষ্টিংস্-পত্নী কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস ঘাট নামে একটি ঘাট এখনও এখানে আছে। বর্ত্তমানে রিষড়া পাট কলের জন্য বিখ্যাত।

শ্রীরামপুর—হাওড়া হইতে ১৩ মাইল দূর। ইহা ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এবং হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা। ব্রিটিশ অধিকারের প্রাক্কালে ইহা দিনেমারগণের অধিকৃত ছিল এবং ডেনমার্ক রাজের নামে ইহার নাম ছিল ফ্রেড্রিকনগর। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দিনেমারদিগকে পরাজিত করিয়া শ্রীরামপুর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী ইহা পুনরায় দিনেমারগণের অধিকারভুক্ত হয়। শেষে দিনেমারগণ এই স্থানটি ইংরেজগণের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। এইরূপে দিনেমারগণের বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টার অবসান হয়। শ্রীরামপুর আদালতের নিকটে তাঁহাদের গোরস্থান দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টান মিশনারীগণের সংশ্রবের জন্যই শ্রীরামপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার গঠন ও পুষ্টিসাধনে এই স্থানের দান অমূল্য। সুবিখ্যাত পাদরী মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্যোগে এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ভারতের মানচিত্র এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা বাইবেলের শেষ অংশ মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান সমাধি ক্ষেত্রে এই মনীষিত্রয়ের সমাধি বাঙালী মাত্রেরই দর্শনীয়। শ্রীরামপুরের কলেজটিও এই মিশনারীগণের অন্যতম কীর্ত্তি। এই কলেজ-গৃহটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য ভবন। ইহার ঠিক্ বিপরীত দিকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বারাকপুরে লাটসাহেবের মনোরম উদ্যান-বাটি অবস্থিত। শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারে কেরির ব্যবহৃত চেয়ার প্রভৃতি রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র এই কলেজ হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপাধি প্রদান করা হয়। "সেণ্ট্ ওলাফ্" নামক গির্জা শ্রীরামপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ইহা প্রথমে দিনেমার দিগের ছিল। গির্জার ফটকে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের নামের আদ্যক্ষর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ম্যাজিস্ট্রেট্ আদালতের পূর্ব্বদিকে দিনেমার শাসন-কর্ত্তার বাস ভবন ছিল।

শ্রীরামপুরে কয়েকটি পাটকল ও কাপড়ের কল এবং একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে।

শ্রীরামপুরের চাতরা নামক পল্লীতে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। এখানে বৈশাখ মাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর পর দিন হইতে শ্রীরামপুরে একমাস স্থায়ী একটি মেলা হয়। এই মেলাটি "ক্ষেত্র সাহার মেলা" নামে প্রসিদ্ধ।

এখানকার গোস্বামিগণ বাংলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার বংশ।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ ও বল্লভপুর গ্রামে জগন্নাথ দেব ও রাধাবল্লভজীর দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। মাহেশের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেলা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই রথের মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ জিনিসপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী" নামক উপন্যাসে মাহেশের রথের মেলার সুন্দর বর্ণনা আছে। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীরামপুরে "দ্বাদশ গোপাল" নামে অপর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভপুরের রাধাবল্লভের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বে এই স্থান অরণ্যময় ছিল এবং চাতরার রুদ্র-পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া তপস্যা করিতে থাকেন; রাধাবল্লভ সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়া তাঁহাকে গৌড়ের সুলতানের শয়ন কক্ষের দ্বারদেশের প্রস্তরখণ্ড লইয়া আসিয়া তাহা হইতে বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। রুদ্র পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সুলতানের হিন্দু প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থী হন। ইতিমধ্যে সুলতানের শয়নকক্ষের প্রস্তর খণ্ডটি হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল বাহির হইতে দেখা যায়। প্রধান মন্ত্রী তখন সুলতানকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন প্রস্তর খণ্ডটি হইতে অশ্রু বাহির হইতেছে এবং অবিলম্বে ইহাকে প্রাসাদের বাহির করা উচিত। রুদ্র পণ্ডিতকে তখন ইহা লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। রুদ্র পণ্ডিত তখন মুস্কিলে পড়িলেন কি করিয়া এই ভারী পাথর বহিয়া লইয়া যান। রাধাবল্লভ তখন স্বপ্নে তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া গিয়া পাথরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই পাথরটি ভাসিতে

ভাসিতে বল্লভপুরের স্নানের ঘাটে আপনি গিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্র পণ্ডিত একটি ভাস্করের সাহায্যে ইহা হইতে তিনটি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। (পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের "খড়দহ" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া দলে দলে লোক পূজা দিতে আসিতে লাগিল এবং শীঘ্রই ইহার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। নদীর ভাঙনের জন্য পুরাতন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নূতন মন্দির কলিকাতার মল্লিকগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। লর্ড ক্লাইভের মুন্শী সুপ্রসিদ্ধ রাজা নবকৃষ্ণ রাধাবল্লভের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং ইঁহার পূজার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

রাধাবল্লভের মূর্ত্তিটি ভাস্কর্য্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল কমলাকর পিপলাই এর পাট মাহেশে অবস্থিত।

শেওড়াফুলি জংশন—হাওড়া হইতে ১৪ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২২ মাইল দূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে রাজা নামে পরিচিত একঘর প্রাচীন জমিদারের বাস। এই বংশের রাজা মনোহরচন্দ্র বহু চতুষ্পাঠী ও মন্দির স্থাপন করেন। ইনিই মাহেশের প্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখনও রথের দিনে শেওড়াফুলির জমিদার বাটীর অনুমতি লইয়া মাহেশের রথ চালানো হয়। শেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী কালীর একটি মন্দির আছে। ইহা রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই কালীর মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। শেওড়াফুলির হাট খুব বিখ্যাত। এই হাট হইতে বহু তরীতরকারী কলিকাতায় আমদানি হয়।

বৈদ্যবাটী—হাওড়া হইতে ১৫ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন পল্লী। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদসদাগর একটি নিমগাছে পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। উহা নিমতীর্থের ঘাট নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে পুরীগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাটের নিকট একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল; তদবধি এই স্থান নিমাই তীর্থের ঘাট নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকে এই শেষোক্তনামই ব্যবহার করেন। বৈদ্যবাটীর ভদ্রকালী দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই দেবীর নামানুসারে পল্লীর এক অংশের নাম "ভদ্রকালী" হইয়াছে। বাংলার প্রথম উপন্যাস টেক্ চাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল"—এ বৈদ্যবাটীর উল্লেখ আছে। শেওড়াফুলির ন্যায় বৈদ্যবাটিতেও একটি বড় হাট আছে।

ভদ্রেশ্বর—হাওড়া হইতে ১৮ মাইল দূর। ইহাও ভাগীরথী কূলে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ভদ্রেশ্বর শিবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায় ভদ্রেশ্বরও স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। শিবরাত্রি, বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে এ স্থানে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল। এখন অনেক গুলি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তেলিনীপাড়া একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির এদিককার একটি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু।

চন্দননগর—হাওড়া হইতে ২১ মাইল দূর। ভাগীরথী তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র ফরাসী ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার বর্ত্তমানে নাই। চারিদিকে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানের মধ্যে একমাত্র চন্দননগরই ফরাসী অধিকারভুক্ত স্থান। বাংলায় যখন মুসলমান, ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে ভাগ্যপরীক্ষার যুদ্ধ চলিতেছিল তখন চন্দননগরের উপর দিয়া অনেক উপদ্রবের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে লব্ধ সনদের বলে ফরাসীগণ চন্দননগরের অধিকার লাভ করেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে চেতোয়াবরদার রাজা শোভা সিংহের অত্যাচার হইতে শহর রক্ষার জন্য ফরাসীগণ এখানে ফোর্ট দ্য আরলাঁ (Fort D'Orleans) নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি পুলিশভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ্চ তারিখে এই দুর্গের পাদমূলে ইংরেজ ও ফরাসীর ভাগ্য পরীক্ষা হইয়াছিল। চন্দননগরের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ ছিল গবর্ণর ডুপ্লের শাসনকাল ১৭৩১—১৭৪১ খৃষ্টাব্দ। ডুপ্লে এখানে ফরাসী বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং ইহাকে একটি মনোরম শহরে পরিণত করেন। বর্ত্তমানে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আর নাই। পূর্ব্বে চন্দননগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন য়ুরোপেও রপ্তানি হইত। এখনও বাজারে ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের যথেষ্ট নাম আছে। য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে চন্দননগর কয়েকবার ইংরেজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন হইলে উহা পুনরায় ফরাসীগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। বর্ত্তমানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকার গরুটি (গৌরহাটি) চাঁপদানি, মানকুণ্ডু, গোঁদলপাড়া ও খাস চন্দননগরের কতকাংশ লইয়া বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথটি বড় সুন্দর। সরকারী কার্য্যালয় ও হোটেল প্রভৃতি এই রাস্তার উপর অবস্থিত। গোঁদলপাড়ার এক অংশ আজও দিনেমার ডাঙ্গা নামে পরিচিত; ঐ স্থানে দিনেমারগণের একটি কুঠি ছিল। চন্দননগরে প্রুশিয়ান বা জার্ম্মানদেরও একটি কুঠি ছিল। সম্রাট্ ফ্রেডারিক দি গ্রেট "বেংগলিশে হাণ্ডেলজ গেজেল শাখাট" নামে একটি কোম্পানি গঠন করিয়া ব্যবসায়ের উৎসাহ প্রদান করেন। ফোর্ট্ দ্য আরলাঁর এক মাইল দক্ষিণে জার্ম্মাণ্ কুঠি অবস্থিত ছিল।

চন্দননগরের সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা রাসু, নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনি, এণ্টনি ফিরিঙ্গি ও বলরাম কপালী, পাচালী গায়ক চিন্তামালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি এবং প্রসিদ্ধ যাত্রা-ওয়ালা মদন মাস্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই স্থানে বাস করিতেন। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় পূর্ব্বে অনেকগুলি টোল ছিল।

এখানকার প্রাচীন গৌরবের মধ্যে নন্দদুলালের মন্দির, বোড়াইচণ্ডী, দশভুজা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং তাউৎখানার বাগানে ওলন্দাজ গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ, ভাগীরথী তীরে কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জ্জা, কোম্পানীর আমলের গোরস্থান ও লালদীঘি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ভাগীরথী তীরস্থ গির্জ্জাটি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় মিশনরীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান যুগের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ডুপ্লে কলেজ ও স্কুল, চন্দননগর গ্রন্থাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম উল্লেখ যোগ্য।

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙেঘর উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় একটি মেলা হইয়া থাকে।

চুঁচুড়া—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। ওলন্দাজগণের সহিত সংশ্রবের জন্যই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু অবগত হওয়া যায় না। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ মুঘল হস্তে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা বণিকরূপেই এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ দিগকে শাসন ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহারাও সে দিকে মনোযোগ দেন। মীরজাফর গোপনে তাঁহাদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। চুঁচুড়া কিছুকাল ব্যাটেভিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাটেভিয়া হইতে কতকগুলি ওলন্দাজ রণতরী সৈন্যসামন্ত লইয়া এদেশে উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তখন ওলন্দাজগণকে বাধা প্রদান করেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তাঁহাদের রণতরীগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ওলন্দাজগণ এদেশে শুধু বাণিজ্য কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন। ওলন্দাজগণের উন্নতির সময়ে তাঁহারা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গাস্টেভাস্ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। চুঁচুড়া অধিকার করিবার পর ইংরেজগণ এই দুর্গটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি ব্যারাক্ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই ব্যারাকে হুগলী জেলার কাছারী ও কালেক্টরি অবস্থিত। এইরূপ দীর্ঘ অট্টালিকা খুব কমই দেখা যায়।

ইংরেজদিগের হস্তে পরাজিত হইবার পরও ওলন্দাজগণ বাণিজ্যসূত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত এই দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম পাদে তাহাদের বাণিজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ওলন্দাজগণ সুমাত্রার পরিবর্ত্তে ইংরেজগণকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দেন।

ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজগণ বাঙালীদের সহিত মেলামেশা ও তাঁহাদের রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আহারান্তে আলবোলায় ধূমপান করিতেন।

ওলন্দাজদের সময়ে অনেক আর্ম্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। স্থানীয় আর্ম্মানি গির্জাটি খোজা জোহানেসের পুত্র প্রসিদ্ধ আর্ম্মেনীয় মার্কার কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই গির্জাটি "সেণ্ট জন্ দি ব্যাপটিস্ট" এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। আজিও প্রতিবৎসর ২৭এ জানুয়ারী এখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

হুগলীর মহশীন কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা চুঁচুড়ায় অবস্থিত। ইহা স্বনামধন্য দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের অমর কীর্ত্তি।

এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে আর্ম্মেনীয়গণের দ্বারা নির্ম্মিত গির্জা, গঙ্গাতীরবর্ত্তী গির্জা এবং ওলন্দাজ ও আর্ম্মেনীয়গণের পুরাতন গোরস্থান উল্লেখযোগ্য। এখানকার আর্ম্মানিটোলা, মুঘল টুলি, ফিরিঙ্গিটোলা প্রভৃতি পাড়ার নাম চুঁচুড়ার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্ত্তী ভাগীরথী কূলে গোস্বামীঘাটে "কনে' বৌএর মন্দির" নামে একটি প্রকাণ্ড পরিত্যক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে পূর্ব্বে ইহা কালীর মন্দির ছিল এবং দেবী সরকার নামে এক ব্যক্তি বাটীর কনিষ্ঠা বধুর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "কনে বৌএর মন্দির"।

চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরজীউ নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন।

প্রথম ভারতীয় প্রিভিকাউনসিলার সুপণ্ডিত সৈয়দ স্যর আমীরআলি চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রণেতা রামরাম বসু, স্বনামখ্যাত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং "সাধারণী" সম্পাদক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

চুঁচুড়া হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দাদপুর গ্রাম এককালে চিকণ শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পরিমানে চিকণ রপ্তানি হইত।

হুগলী—হাওড়া হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার সদর শহর। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটিতে প্রচুর হোগলা বন ছিল বলিয়াই ইহার নাম হুগলী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন পর্ত্তুগীজগণ গোলাকে গোলিন বলিতেন এবং এই স্থানে অবস্থিত তাঁহাদের গোলাগঞ্জকে তাঁহারা গোলিন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই "হুগলী" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগীরথীর তীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং তাঁহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাট আক্‌বরের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারের ফলে বাংলার তৎকালীন সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং পর্ত্তুগীজগণই উক্ত বাণিজ্যের অধিকারী হন। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে হুগলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। এইভাবে হুগলী তৎকালে প্রাচ্যের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। সম্রাট হইবার পূর্ব্বে শাহজাহান বাংলায় আসিয়া দেশীয় লোকদের উপর পর্ত্তুগীজগণের নানারূপ অত্যাচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট হইবার পর তিনি পর্ত্তুগীজ দমনের জন্য সুবাদার কাসেম খাঁর নেতৃত্বে একদল মুঘল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনী প্রায় তিন চার মাস ধরিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া থাকে এবং শ্রীরামপুরের নিকট ভাগীরথী বক্ষে একটি সেতুবন্ধন করে। পর্ত্তুগীজগণ আত্মসমর্পণ না করায় মুঘল সৈন্য ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ গির্জার সম্মুখের পরিখার জল সেচন করিয়া উহাতে বারুদ পুতিয়া অগ্নিসংযোগ করে এবং তৎফলে দুর্গপ্রাচীর কিয়দংশ উড়িয়া যায়। ভগ্নস্থানের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে প্রায় এক হাজার লোক নিহত ও চার হাজার পর্ত্তুগীজ মুঘলহস্তে বন্দী হয়। দুই হাজার লোকপূর্ণ পর্ত্তুগীজদিগের একখানি জাহাজ মুঘলহস্তে পড়িবার উপক্রম হইলে শত্রুহস্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ বারুদে আগুন দিয়া জাহাজখানি উড়াইয়া দেন। অন্যান্য অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজও এই পন্থা অবলম্বন করে। এই জাহাজ সকলের অগ্নিকাণ্ডের ফলে মুঘলনির্ম্মিত সেতু দগ্ধ হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণের ৬৪ খানি বড় জাহাজ, ৫৭ খানি গ্রাব ও ২০০ স্লুপের মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাব ও দুইখানি স্লুপ পলাইয়া গিয়া গোয়ায় পৌছিতে সক্ষম হয়। ইহা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এই সময় হইতেই বাংলায় পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়েই সপ্তগ্রামের ফৌজদারী কাছারি ও সরকারী কার্য্যালয় হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং হুগলী বন্দরের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাংলা আক্রমণ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীখাকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া হুগলীর দুর্গ অধিকার করেন। মীর হাবিব দুর্গাধ্যক্ষ ও শিব রাও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হইলে তাঁহারা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরে পলাইতে বাধ্য হন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কুঠির অধীনে কাশীমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করিয়া সোরা ও রেশমের ব্যবসায়ে কোম্পানি বিশেষ লাভবান হন। জব চার্ণকের সময়েই হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের সহিত বিবাদের জন্য ইংরেজেরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া ফৌজদারের কবল হইতে দূরে সুতানুটিতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন এবং তাহার ফলেই বর্ত্তমান কলিকাতা শহর গড়িয়া উঠে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্লাইভের সময়ে ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ ও ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া হুগলী ও নিকটস্থ গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর্ত্তমানে যে স্থানে হুগলীর কলেক্টরের বাসভবন এবং পুরাতন কাছারী বাড়ী আছে সেই স্থানেই মুঘলদিগের দুর্গ ছিল।

বাংলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স সাহেব এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানায় হ্যালহেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের সুপ্রসিদ্ধ ইমামবাড়া এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহা প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার গম্বুজ প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ। ইহার দেওয়ালে কোর-আনের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। নিকটস্থ তাঁহার বাগিচা ও সমাধিও এখানকার দ্রষ্টব্য।

অতিরিক্ত বিলাসী ও অলস ব্যক্তির তুলনা করিতে গিয়া লোকে কথায় বলে, লোকটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। খাজাহান খাঁ বা খাঞ্জা খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের রাজধানী তিহরাণ হইতে ভারতে আসিয়া মুঘল বাদ্শাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে ফৌজদার ওমরবেগের পর তিনি হুগলীতে ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারের পদ উঠিয়া গেলে তিনি কোম্পানির নিকট হইতে মাসিক ২৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন।

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধ দানবীর গৌরী সেন প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী শহরের অন্তর্গত বালি মহাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। বাণিজ্যের দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন এবং উহার অধিকাংশই দানকার্য্যে ব্যয় করেন। কথিত আছে অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোকগণ পাছে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন সেই জন্য তিনি দোকানদারগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম লইয়া কেহ কিছু কিনিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহা দেওয়া হয়। পরে তিনি উহার মূল্য দিয়া দিতেন। ইহা হইতেই প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির হুগলীতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

বালিতে রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ী ও চতুরদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত বড় আখড়া দ্রষ্টব্য স্থান। তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বে চতুর দাস বাবাজী এখানে আসিয়া আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাংশ খামারপাড়ায় একটি শাখা আখড়া আছে। চতুর দাস বাবাজীর সমাধিকে সকলে ভক্তি করে।

হুগলীতে মল্লিক কাশীমের হাট নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত হাট আছে।

ব্যাণ্ডেল জংশন—হাওড়া হইতে ২৫ মাইল দূর। বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে ইহা পর্তুগীজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ এখানে একটি সুবৃহৎ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলার আদি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। বালক যীশু ও মাতা মেরীর মূর্ত্তি এখানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজিত হয় এবং রোগ আরোগ্য ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবার আশায় বহু রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই গির্জ্জাটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

এই গির্জ্জাটি একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হস্তে পর্তুগীজগণ পরাজিত এবং মুঘল কর্ত্তৃক হুগলী অধিকৃত হইবার সময় পর্তুগীজগণের দুর্গ ও এই গির্জ্জা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মুঘলগণ বহু খৃষ্টানকে বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া যায়। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বন্দী পাদ্রী দা'ক্রুজকে একটি মত্ত হস্তীর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে পদদলিত না করিয়া শুঁড় দিয়া আদর করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ভীত ও বিস্মিত হইয়া দা'ক্রুজকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার অনুরোধে ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা পুনরায় নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বহু নিষ্কর জমি প্রদান করেন। মত্ত হস্তীর পদতল হইতে পাদ্রী দা'ক্রুজের আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটির স্মরণে আজও প্রতিবৎসর এই গির্জ্জায় "ডোমিংগো দা'ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাদ, এই গির্জ্জায় মাতা মেরীর যে মূর্ত্তি আছে উহা পূর্ব্বে হুগলীস্থ পর্তুগীজ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাদ্রী দা'ক্রুজ ও তাঁহার এক স্বজাতীয় বণিক বন্ধু এই মূর্ত্তির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মুঘল পর্তুগীজ সংঘর্ষের সময় উক্ত বণিক্ লাঞ্ছনার হাত হইতে এই মূর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কিন্তু মূর্ত্তি বা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাদ্রী দা'ক্রুজ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মূর্ত্তিটির উদ্ধার সাধনের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকেন। আগ্রা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার সংস্কার আরম্ভ করেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে গির্জ্জার সম্মুখে নদীর জল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে। সেই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে পাদ্রী দা'ক্রুজ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন বহুদিন পূর্ব্বে জলমগ্ন তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নালোকে নদীর এক অংশ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এক ব্যক্তি গির্জ্জার দিকে আসিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল এবং নদীর আলোকিত অংশ পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর পাদ্রী দা'ক্রুজ দেখিলেন, বহু লোক গির্জ্জার সম্মুখে একত্র হইয়া বলাবলি করিতেছে "গুরুমা আসিয়াছেন"।

দা ক্রুজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাঁহার সেই অতি প্রিয় মেরীর মূর্ত্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল পূর্ব্ব রাত্রে তিনি যে তাঁহার বণিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র স্বপ্ন নহে। অতঃপর মহা আড়ম্বরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তল প্রোথিত দেখা যায়। যে দিন মাতা মেরীর মূর্ত্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অকস্মাৎ একখানি বড় পর্ত্তুগীজ জাহাজ গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ বলেন যে তাঁহারা বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েন; জাহাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা ও মানত করেন যে তিনি যেন কৃপা করিয়া জাহাজখানিকে কোন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেন। কিছু পরে ঝড় থামিলে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পান যে জাহাজখানি এই গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। জাহাজের নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত রক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ হইতে একটি মাস্তল লইয়া গির্জ্জায় উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই উৎসর্গীকৃত মাস্তল গির্জ্জার প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝড়, জল ও রৌদ্র ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই জাহাজ বা অধ্যক্ষের নাম জানা যায় নাই।

ব্যাণ্ডেল জংশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রাম পরলোকগত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। সুপ্রসিদ্ধ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রও কিছুদিন দেবানন্দপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে শরৎ চন্দ্র ও ভারত চন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল হইতে একটি শাখা লাইন জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের নৈহাটি স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নবদ্বীপ ও কাটোয়া হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তগত বারহাড়োয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আদি সপ্তগ্রাম—হাওড়া হইতে ২৭ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত স্থান ছিল ও তৎকালে ইহা একটি তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের রাজা প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র এই স্থানে তপস্যা করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় সপ্তগ্রাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম"। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল, মাধবাচার্য্যে চণ্ডী এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত "পবনদূতম্" নামক কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এক সময়ে ইহার খ্যাতি সুদূর রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ ইহাকে গ্রীকগণ বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া মনে করেন। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীর সমাগম হইত। নিকটস্থ হুগলী বন্দরের অভ্যুথান এবং সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ার সহিত সপ্তগ্রামের পতন ঘটে এবং ক্রমে ইহার সমুদয় ব্যবসাবাণিজ্য হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। মুঘলগণের হস্তে পর্ত্তুগীজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলীতে গিয়া বসেন এবং সমস্ত সরকারী কার্য্যালয়ও তথায় চলিয়া যায়। পূর্ব্বকালে সরস্বতীর খাত দিয়াই ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত এবং দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও ছিল সরস্বতী নদী।

সপ্তগ্রাম প্রাচ্যের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সরস্বতীর তীরে অবস্থিত গ্রাম ও নগরগুলি বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। শিয়াখালা, সিঙ্গুর, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ, আন্দুল, হরিপাল প্রভৃতি সরস্বতী তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি নিরন্তর কর্ম্মকোলাহলে মুখরিত হইত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে বহু পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রুকন্-উদ্-দীন কৈকাউস্ শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে উলুগ-ই-আজম্ জাফর খাঁ বাহরাম ইৎগীন রাঢ় দেশের তৎকালীন প্রধান নগর সপ্তগ্রাম জয় করেন। যে হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি সপ্তগ্রাম অধিকার করেন তাঁহার নাম জানা যায় নাই। কবি কৃষ্ণরামের "ষষ্ঠীমঙ্গল" কাব্য হইতে অনুমান করা যায় যে শক্রজিৎ বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন রাজার সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে আইসে। সপ্তগ্রাম জয় করিয়া জাফর খাঁ নিকটস্থ ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটি খিলানে আরবী ভাষায় লিখিত যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে জাফর খা ৬৯৮ হিজরায় অথাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু রাজাকে পরাজিত ও এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁর মৃত্যু হয়। ত্রিবেণীতে তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদের নিকট গঙ্গা-সরস্বতীর মিলনস্থলের অদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। এই মন্দির পরে মস্‌জিদে পরিণত হয়।

কাহারও কাহারও মতে জাফর খাঁর অপর নাম দরাফ খা এবং তিনি নাকি গঙ্গার ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র দরাফ্ খাঁর নামে প্রচলিত আছে।

১২৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মিশর দেশীয় পর্য্যটক ইবন বতুতা সপ্তগ্রামে আগমন করেন। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে সে সময়ে বলবন বংশীয় রাজাদের প্রভুত্ব লোপ পাইলে তাঁহাদের ভৃত্য ফকর-উদ-দীন সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন।

গৌড়াধিপ প্রসিদ্ধ আলা-উদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে সপ্তগ্রামের নাম "হুসেনাবাদ" রাখা হয়। এখানে একটি টাকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে মুদ্রিত সের শাহ, হুসেন শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান নরপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

গৌড়ের প্রসিদ্ধ নৃপতি সুলেমান কররানি যখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করিতে উদ্যোগী হন তখন ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সাহায্য গ্রহণ করেন। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা বিখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ ও ওড়িষ্যার সম্মিলিত সেনাবাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য আক্রমণ পূর্বক সপ্তগ্রামে আসিয়া সুলেমানের সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকৃত হয়। সপ্তগ্রাম পুনরধিকারের জন্য সুলেমান বহু চেষ্টা করেন কিন্তু পর পর চার বার রাজীবলোচনের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর তিনি রুদ্রনারায়ণকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও সপ্তগ্রাম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বর্ণিত আছে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে রূপা বা পরম ভট্টারক শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ নামে বাগ্দী জাতীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি সপ্তগ্রামে একটি বিহার বা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন; ইঁহার কীর্ত্তির কোন চিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না।

সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত আছে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সময়ে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য মজুমদার নামক দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রামের "অধিকারী" বা রাজা ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার উপর ছিল। হিরণ্য মজুমদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণব জগতের চির-সম্মানিত ষট্ গোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে সপ্তগ্রামে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডী-রচয়িতা পরাশরপুত্র সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা তীরে ন্যানপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

সপ্তগ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত একটি মস্জিদ ও কয়েকটি কবর আছে। উহা এখন সরকারের "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের অন্তর্গত। মসজিদের শিলা-লেখ হইতে জানা যায় যে ক্যাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আমুল নগর নিবাসী সৈয়দ ফক্রুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ জমালদীন হুসেন ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আবুল মুজাফ্ফর নুছ্‌রা শাহের রাজত্ব কালে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

মগরা—হাওড়া হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথ নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে লাইনের সহিত ইহা একটি জংশন স্টেশন। মগরা হইতে এই ছোট রেল ত্রিবেণী ও অপরদিকে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই ছোট রেল দিয়া তারকেশ্বর যাইবার পথে মহানাদ ও দ্বারবাসিনী অতি প্রাচীন স্থান।

অনেকে অনুমান করেন যে মহানাদে এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল। এই স্থানে হিন্দু আমলের পুরাতন কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি প্রাচীন দীঘি ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। গড়পাড়া বা গড়ের বাগান নামক স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর গড় ছিল এইরূপ জনপ্রবাদ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এখনও গড়ের কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি খননের দ্বারা মহানাদের প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মহানাদের নিকটবর্ত্তী দ্বারবাসিনীতে দ্বারপাল প্রভৃতি গোপরাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। এখানে জীয়ৎকুণ্ড নামক পুষ্করিণী, সাত সতীনের দীঘি, দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির ও পাপহরণ সরোবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তু।

মহানাদের জটেশ্বরনাথ মহাদেবের পুরাতন মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা রাজা চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটি বড় মেলা হয়, উহা "মানাদের জাত" নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সম্মুখস্থ জাততলায় কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ আছে, এইগুলি প্রাচীনযুগের

বৌদ্ধশ্রমণ ও মহান্তগণের সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়। একটি সমাধি "জীবন্ত সমাধি" নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ইহার মধ্যে একজন যোগী নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন আছেন।

মহানাদের বশিষ্ঠগঙ্গা, জীয়ৎকুণ্ড, জামাইজাঙ্গাল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তু। জীয়ৎকুণ্ড দেবখাত বলিয়া লোকের বিশ্বাস এবং মুসলমানযুগে ইহা অপবিত্র হইবার পূর্ব্বে এই কুণ্ডের জল সিঞ্চনে মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার হইত বলিয়া প্রবাদ। মহানাদরাজ চন্দ্রকেতুর জামাতা ত্রিপুরার রাজপুত্রের অনুরোধে জামাইজাঙ্গাল নামক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পুরাকালে এই স্থানে মহাশঙ্খের নিনাদ হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম "মহানাদ" হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

পাণ্ডুয়া—হাওড়া হইতে ৩৮ মাইল দূর। ইহার চলিত নাম পেঁড়ো। বাংলাদেশে মালদহ জেলায় আরও একটি পাণ্ডুয়া আছে। উহা পূর্ববঙ্গ রেলপথের আদিনা স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে গৌড়ের পাণ্ডুয়ার অনুকরণে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ পাণ্ডুদাসের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাণ্ডুয়া হয়। এরূপও কথিত আছে, বুদ্ধদেবের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্যের পুত্র পাণ্ডুশাক্য পরিবারবর্গসহ পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারা নামানুসারেই রাজধানী পণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত হয়।

গৌড়রাজ শমস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য জয় করেন। তখন পাণ্ডুয়ায় বহু মন্দির ছিল। এই নগর অধিকার করিয়া মুসলমানগণ এখানকার অতি প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখন "বাইশ দরওয়াজা" নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলা স্তম্ভ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। মস্‌জিদের বেদী বা মেম্বর একটি হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ। ব্রহ্ম শিলা নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাতে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইউসুফ শাহের রাজ্যকালে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লাল কুনওয়ার নাথ নামক জনৈক হিন্দু এই মস্‌জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও একটি ভগ্ন-মস্‌জিদ আছে। পাণ্ডুয়ায় একটি মিনার আছে। উহার উচ্চতা ১২৭ ফুট। মিনারটি গোলাকার, পাচতল-ওয়ালা ও উপরদিকে ক্রমশঃ সরু। "পেঁড়োর পীর" নামে খ্যাত শাহ্‌ সুফী-উদ্দীন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই মিনারটি পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল। ইহার ভিতরকার দেওয়ালে মীনার কাজ আছে।

পীর শাহ্‌ সুফী-উদ্দীনের আস্তানা এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পাণ্ডুয়ায় রোজাপুকুর ও পীরপুকুর নামে দুইটি দীঘি আছে। বাগেরহাটের খান্-জাহান্ আলীর দীঘির ন্যায় পাণ্ডুয়ার পীরপুকুরে কতকগুলি কুমীর আছে। উহারা ফকিরগণের আহ্বানে কিনারার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ এখানে মেলা বসে এবং রাত্রি ৩টা হইতে পীরপুকুরে স্নান করিয়া লোকে ধান ও কড়ি ছড়াইতে পীরের আস্তানায় যাইয়া অর্ঘ্য নিবেদন করেন। কেহ বা পথে বসিয়া কোরআন্ আবৃত্তি ও ধর্ম্মসঙ্গীত গান করেন। যাত্রীরা পীরপুকুরের জল লইয়া যান। চৈত্র মাসেও একটি মেলা বসে।

হাওড়া স্টেশন (পৃষ্ঠা ৬৭)

রামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় (পৃষ্ঠা ৬৮)

ওয়েলিংডন সেতু, বালী (পৃষ্ঠা ৬৮)

হেষ্টিংস হাউস, রিষড়া (পৃষ্ঠা ৬৯)
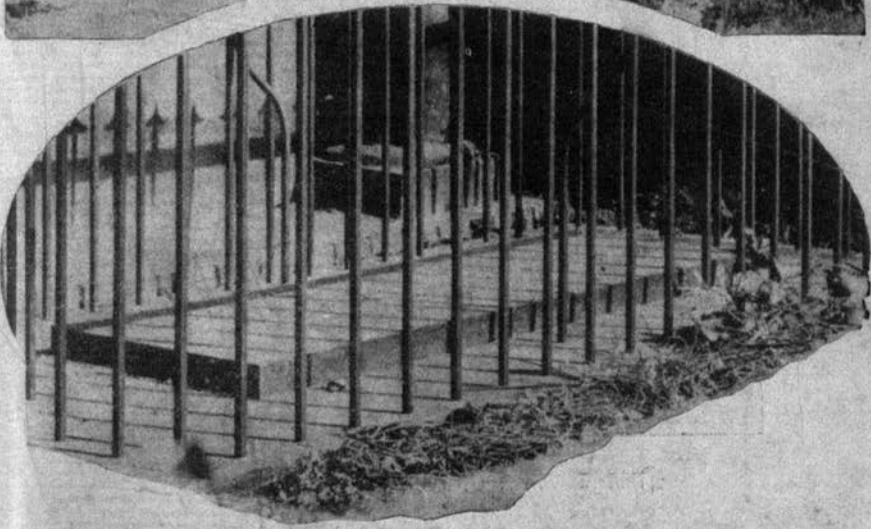
ওয়ার্ড, মার্শমান ও কেরির সমাধি (পৃষ্ঠা ৭০)
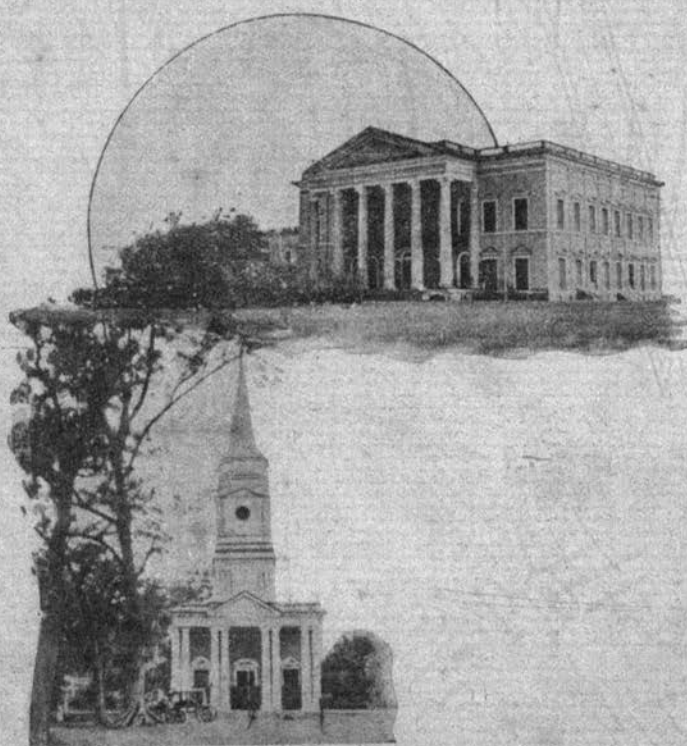
শ্রীরামপুর কলেজ, সেন্ট ওলাফ গির্জা (পৃষ্ঠা ৭০)

জগন্নাথ দেবের মন্দির, মাহেশ (পৃষ্ঠা ৭০)
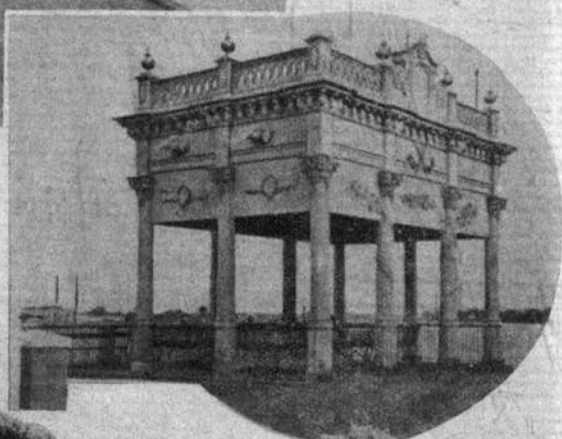
রাজপথ, ঘাট ও গির্জ্জা, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)
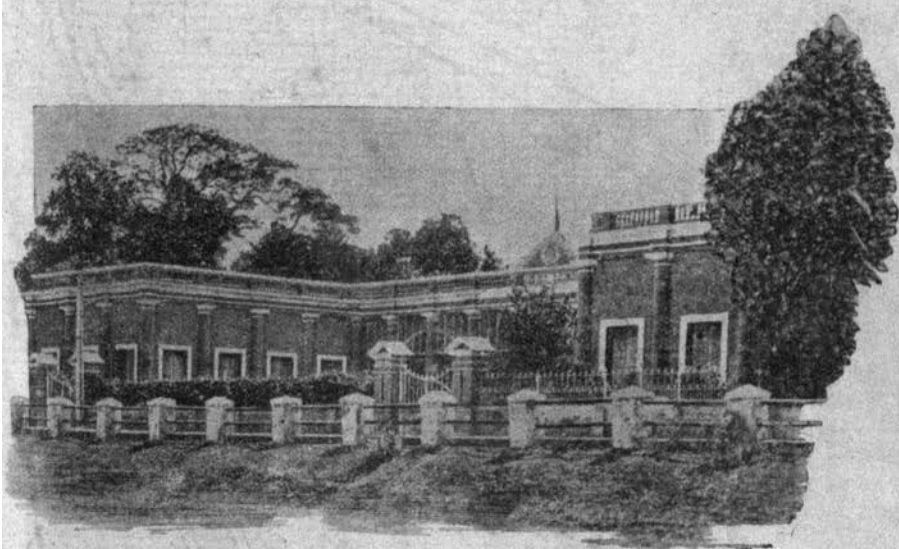
গবর্ণরের বাটী, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)

পুরাতন ওলন্দাজ কবরখানা, কবরের উপর দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত
নরকপাল ও আর্ম্মানি গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৩)

পীরের আস্তানা থাকার জন্য পাণ্ডুয়ায় বহুমুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

পাণ্ডুয়ায় বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস আছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বিচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য যখন কাজী নিযুক্ত করা হইত সে সময়ে পাণ্ডুয়া হইতে বহু লোক এই কার্য্য করিতেন।

এক কালে পাণ্ডুয়া পাতলা ও মজবুত কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট্ অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে এই কাগজ সরবরাহ করিতেন।

পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কবিওয়ালা রামনিধি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গান "নিধুর টপ্পা" নামে খ্যাত। তাঁহার সুন্দর প্রেমসঙ্গীতগুলি সেকালে বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জংশন—হাওড়া হইতে ৬৭ মাইল দূর। বর্দ্ধমান শহরটি বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার ন্যায় প্রাচীন শহর বাংলাদেশে অতি অল্পই আছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী পার্থেলিস্ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। অনেকে অনুমান করেন যে প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম "বর্দ্ধমান" হইতেই এই স্থানের নাম বর্দ্ধমান হইয়াছে। প্রাচীন জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ "অঙ্গ" পাঠে জানা যায় যে মহাবীর স্বামী ৫৪২ হইতে ৫৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাঢ়দেশের চুয়াড়দিগের উন্নতিবিধানে উদ্যমশীল হন। প্রথমে তিনি চুয়াড়গণের নিকট অপমানিত ও প্রহৃত হন, পরে তিনি তাঁহাদিগের ও রাঢ়ের অন্যান্য অধিবাসগিণের নিকট পূজিত হন। কথিত আছে, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান নগরেই তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন। মহাকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানকে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাদল এই স্থানে দায়ুদ খাঁর পরিজনগণকে বন্দী করে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে জগৎবিখ্যাত সুন্দরী ইতিহাস প্রসিদ্ধ নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের অফগান এই স্থানে নিহত হন। যুবরাজ অবস্থায় জাহাঙ্গীর (সেলিম) নূরজাহান বা মেহেরুন্নিসার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাহাতে সম্মত না হইয়া শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দেন ও তাঁহাদিগকে সুদূর বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া কুতব-উদ্-দীনকে বাংলার শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠান। কুতব শের আফগানকে পত্নীত্যাগের কথা বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও নিহত করেন, কিন্তু কুতবের অস্ত্রাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। শের আফগান ও কুতব-উদ্-দীনের সমাধি বর্দ্ধমান শহরের পীর বহরাম নামক পল্লীতে পাশাপাশি অবস্থিত। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া যায়। পরে তিনি সম্রাটের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ খুররম (সাজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাত্যে পরাজিত হওয়ার পর বাংলায় পলাইয়া আসেন এবং বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। ভীষণযুদ্ধে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ নিহত হইলে খুররম তেলিয়াগড়ি দুর্গ অধিকার করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই বর্দ্ধমান রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্দ্ধমানের যাহা কিছু গৌরব তাহা এই রাজবংশের জন্য। লাহোরের সঙ্গম রায় নামক জনৈক কাপুর ক্ষত্রিয় এই রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পথে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ব্যবসায়ের জন্য বসবাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র আবু রায় রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে রেখাবী বাজারের "চৌধুরী" এবং পরে "কোতোয়াল" নিযুক্ত হন। ইঁহার সময় হইতেই বর্দ্ধমান রাজ্যের সূত্রপাত

হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতোয়া-বরদার রাজা শোভাসিংহ রহিম খাঁ নামক এক আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বাদশাহের অনুগৃহীত বর্দ্ধমান রাজ্য আক্রমণ করিয়া বর্দ্ধমান অধিপতি কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত ও তাঁহার পরিজনগণকে বন্দী করেন। কৃষ্ণরামের কন্যার উপর অত্যাচার করিতে গিয়া শোভাসিংহ ছুরিকাঘাতে তাঁহার হস্তে নিহত হন। সাধ্বী কুমারী পাপীর স্পর্শে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া আত্মঘাতিনী হন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী দল রহিম খাঁকে নেতৃপদ প্রদান করে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস্শান বর্দ্ধমানে প্রেরিত হন। বিদ্রোহী দলকে পরাজিত ও রহিম খাঁকে নিহত করিয়া তিনি তিন বৎসরকাল বর্দ্ধমানে বাস করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। বিদ্রোহ দমনের পর কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম বর্দ্ধমান জমিদারী ও বাদশাহের নিকট হইতে রাজা খেতাব লাভ করেন। জগৎরামের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও বরদার রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্ত্তী বর্দ্ধমান রাজগণের মধ্যে তিলকচাঁদ ও মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিলকচাঁদ দিল্লীর সম্রাট শাহআলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ও পাঁচহাজারী সনদ লাভ করিয়াছিলেন। কোন বিষয় লইয়া ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি স্বীয় অধিকারের মধ্যে কোম্পানির জাহাজের প্রবেশ নিষেধ করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিলকচাঁদ বীরভূমরাজের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কোম্পানির সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয় ঘটে। তিলকচাঁদের পর মহারাজ তেজচন্দ্র বর্দ্ধমানের গদীপ্রাপ্ত হন। তিলকচাঁদের এক পুত্র প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল পরে এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে আসিয়া প্রতাপচাঁদ নামে আত্মপরিচয় দেন। ইহাতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। শেষ অবধি জাল প্রতাপচাঁদের দাবী টিকে নাই। সুসাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক পুস্তকে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে "হিজ্ হাইনেস্" উপাধি ও তোপের সম্মান লাভ করেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজা ইঁহার পৌত্র।

পূর্ব্বাপর হইতেই বর্দ্ধমানের রাজগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যাপক, শিল্পী, গায়ক, বাদক, কবি, চিত্রকর ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধমান রাজের বৃত্তিভোগ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত সাধক কবি কমলাকান্ত ও নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমানের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ বহু অর্থব্যয়ে মূল মহাভারতের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

বর্দ্ধমান শহরের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গোলাপবাগ, দিলখোস্ বাগ, শ্যামসায়র ও কৃষ্ণসায়র নামক দীঘি, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির এবং লর্ড কার্জনের সম্মানার্থ নির্ম্মিত "স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক তোরণ উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদটি মহারাজ মহাতাবচাঁদ কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। গোলাপবাগে একটি পশুশালা আছে। কৃষ্ণসায়র দীঘি রাজা কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক খনিত। জনশ্রুতি যে দুর্ব্বৃত্তগণ এই দীঘির মধ্যেই তাঁহাকে নিহত করে।

বর্দ্ধমান শহর হইতে দুই মাইল দূরে নবাবহাট নামক স্থানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির নিকটেই তালিতগড় বা তেলিয়াগড়ির দুর্গ অবস্থিত। তালিত রেল স্টেশনে নামিয়া এই দুর্গটি ও শিবমন্দিরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমান রাজপরিবার তালিতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগেও এ অঞ্চল কৃষি সম্পদে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত এবং বর্দ্ধমানকে "বাংলার বাগিচা" বলা হইত। কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে "বর্দ্ধমান জ্বর" নামে পরিচিত এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য ইহা ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শহরের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, জেলাবোর্ড পরিচালিত একটি টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল ও গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। এখানকার সীতাভোগ, মিহিদানা, খাজা ও ওলা নামক মিষ্টান্ন বিশেষ বিখ্যাত।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তগত কাঞ্চননগর ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বঙ্গরাজ শশাঙ্কদেব কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাঞ্চননগরের নিকটে দামোদর নদের পশ্চিমতীরে রাঙ্গামাটি নামক গ্রাম হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে শশাঙ্ক নামে একটি গ্রাম আছে। নিকটেই পুরাতন দামোদর খাতের উত্তরে গৌরনদের তীরে আর একটি শশাঙ্ক গ্রাম আছে। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে এই অঞ্চলে শশাঙ্কদেবের বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান হইতে একটি ছোট মাপের লাইন এই জেলার কাটোয়া মহকুমা হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত আহ্‌মদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খানা জংশন—হাওড়া হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই স্থান হইতে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন বাহির হইয়াছে।

মানকর—হাওড়া হইতে ৯০ মাইল। এই স্থানটি রেশমের কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল আছে। মানকরের কদমা, ওলা, খাজা প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রসিদ্ধ।

মানকর স্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে অমরারগড় নামক স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ এই স্থানে গোপভূমের সদ্‌গোপ বংশীয় রাজা মহেন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহার সুরক্ষিত গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়।

অনেকের মতে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। রঘুনাথ জন্মাবধি একচক্ষু ছিলেন। দরিদ্র জননী তাঁহার একচক্ষু অসাধারণ বুদ্ধিমান সন্তানকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার আশায় নবদ্বীপে গমন করেন। বালকের অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম মাতাপুত্রের ভার গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া রঘুনাথ

মিথিলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সহিত ন্যায়ালোচনার জন্য মিথিলা গমন করেন। কিছুদিন মিথিলায় অবস্থান করিয়া পক্ষধরের সহিত ন্যায়বিচারে জয়লাভ করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে নবদ্বীপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। "প্রামাণ্যবাদ" "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" "চিন্তামণি দীধিতি" প্রভৃতি গ্রন্থরচনার দ্বারা নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

পানাগড়—হাওড়া হইতে ৯৭ মাইল। স্টেশনের পর হইতেই প্রাচীন জঙ্গল মহালের অল্প অল্প জঙ্গল দেখা যায়। পানাগড় স্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত কাঁক্সা একটি প্রাচীন স্থান। গোপভূম রাজবংশের এক শাখা এখানে বাস করিতেন। কথিত আছে যে সৈয়দ বোখারী নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দার কাঁকসার দুর্গ জয় করেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অনতিদূরে রাজার মস্‌জিদ্ নামে একটি মস্‌জিদ্ আছে। ইহার প্রস্তর গাত্রে হিন্দু ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অণ্ডাল জংশন—হাওড়া হইতে ১১৬ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপরটি উত্তর রাণীগঞ্জের খনিঅঞ্চলে অবস্থিত গৌরাঙ্গদি পর্য্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত শাখা পথে ইকড়া নামক জংশন স্টেশন হইতে অপর একটি শাখা বড়বানী হইয়া ১২ মাইল দূরবর্ত্তী প্রধান লাইনের সীতারামপুর স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা লাইনের উপর উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর, দুবরাজপুর ও শিউড়ী প্রসিদ্ধ স্টেশন।

উখড়া—অণ্ডাল জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রধান গ্রাম ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে বহু সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে।

পাণ্ডবেশ্বর—অণ্ডাল জংশন হইতে ১৩ মাইল দূর। এখানে অজয় তীরে পণ্ডবেশ্বর নামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এখানে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভীমগড় নামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষও এখানে দৃষ্ট হয়।

দুবরাজপুর—অণ্ডাল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। পিতল ও কাঁসার বাসন এবং জাঁতি ও অন্যান্য লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। এই স্থানে বহু প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর।

দুবরাজপুর অঞ্চলের বেলে পাথর প্রসিদ্ধ। এক একটি প্রস্তরখণ্ডের উচ্চতা ও পরিধি ৫০ ফুটেরও অধিক। শহরে এক এক জায়গায় অনেকগুলি এইরূপ পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পাথর দিয়া বহুকাল হইতে দেবমন্দির ও বাসভবন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। এই পাথর গুলি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। রামচন্দ্র কুমারিকা হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু বাঁধিবার জন্য নাকি হিমালয় হইতে পুষ্পক রথে করিয়া পাথর লইয়া যাইতেছিলেন; দুবরাজপুরের উপর দিয়া যাইবার সময়ে রথের ঘোড়া ভয় পাইলে রথ নড়িয়া যায় ও কতকগুলি পাথর এখানে পড়িয়া যায়।

দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ অবস্থিত। ইহা একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে শ্বেত সরোবর নামক উষ্ণ কুণ্ড আছে। উহাতে স্নান করিয়া একটি গহ্বরের মধ্যে নামিয়া বক্রনাথ মহাদেবকে দর্শন করিতে হয়।

বক্রনাথ তীর্থ সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে পুরাকালে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করায় ব্রহ্মবধজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে দারুণ জ্বালা অনুভূত হয়। দেব সমাজে এই কথা প্রচারিত হইলে মহামুনি অষ্টাবক্র নৃসিংহদেবকে জ্বালামুক্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই জ্বালা স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন। জ্বালাপ্রভাবে অষ্টাবক্রকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া নৃসিংহদেব তাঁহাকে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করিতে বলেন। গহ্বর মধ্যে নামিয়া অষ্টাবক্র মুনি বক্রনাথকে স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইলে গুহামধ্য দিয়া সর্ব্বতীর্থের বারি আসিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করে ও তিনি জ্বালামুক্ত হন। শিবরাত্রির সময় বক্রনাথে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির মেলায় লোক-শিল্পের পরিচায়ক কিছু কিছু দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত সরোবর ছাড়া আর যে ৭টি উষ্ণকুণ্ড আছে তাহাদের নাম অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, জীবন কুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড ও খর কুণ্ড। প্রত্যেকটি কুণ্ড সম্বন্ধে এক একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সূর্য্যকুণ্ড সম্বন্ধে কথিত আছে যে একবার নারদ ঋষি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট গিয়া সুমেরু পর্ব্বতের উচ্চতার গুণগান করেন; বিন্ধ্য ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া সগর্ব্বে স্ফীত হইয়া এত উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিলেন যে সূর্য্য আর পৃথিবীতে আলোক ও তাপ দান করিতে সমর্থ হইলেন না। বিপন্ন হইয়া সূর্য্যদেব এই কুণ্ডে আসিয়া শিবের শরণাপন্ন হইয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যকে মস্তক সঙ্কুচিত ও অবনমন করিতে বাধ্য করিলেন। জীবন কুণ্ডের কাহিনী এইরূপ। পুরাকালে সর্ব্ব ও চারুমতী নামে এক বৃদ্ধ ও ধর্ম্মপরায়ণ দম্পত্তি সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ধর্ম্মচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। একদিন একটি বাঘ আসিয়া সর্ব্বকে মারিয়া ফেলেন। চারুমতী দুঃখে তাঁহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবার জন্য মহাদেবের নিকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বামীর হাড়গুলি একত্র করিয়া বক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া এই কুণ্ডের জলে ধৌত করিতে বলিলেন। চারুমতী এইরূপ করিবা মাত্র সর্ব্ব বাঁচিয়া উঠিলেন। ভৈরব কুণ্ড সম্বন্ধে কথিত আছে, যে পূর্ব্বে ব্রহ্মারও পাচটি মুখ থাকায় তিনি শিবের সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিলে শিব রুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক হইতে একটি জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; জটা হইতে তৎক্ষণাৎ বটুক ভৈরব বাহির হইয়া আসিয়া শিবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। বটুক ভৈরব অবিলম্বে আজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার কর্ত্তিত মুখটি তাঁহার অঙ্গুলিতে আটিয়া লাগিয়া রহিল; ভারতের নানা তীর্থে গিয়া তিনি মস্তকটি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না; অবশেষে বারাণসীতে যাইলে মস্তকটি পড়িয়া গেল কিন্তু বটুক ভৈরব আঙ্গুলের ক্ষতে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন; তদবধি কুণ্ডটি ভৈরব কুণ্ড নামে পরিচিত হয়।

এই উষ্ণকুণ্ড গুলির জলের নানা রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া কথিত। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে; কালে হয়তো বক্রেশ্বর একটি আধুনিক আরোগ্য নিকেতনে পরিণত হইবে।

দুবরাজপুর হইতে ২ মাইল পশ্চিমে ফুলবেরা গ্রামে দত্তিন্ দীঘি নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে দন্তেশ্বরীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ; ইহা একটি পীঠস্থান এবং সতীর দন্ত এ স্থানে পড়িয়াছিল বলিয়া কথিত। প্রবাদ দীঘিটি খগাদিত্য রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিব পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম খাগড়ায় দৃষ্ট হয়। দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে জোফলাই গ্রামে পদকর্ত্তা জগদানন্দের নিবাস ছিল; বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে এই গ্রামে প্রতি বৎসর একটি মহোৎসব হয়।

শিউড়ী—অণ্ডাল জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার সদর শহর। শহরের অনতিদূরে ময়ুরাক্ষী নদী প্রবাহিতা। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং পাল্কী, নানাপ্রকার কাঠের দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট মোরব্বার জন্য বিখ্যাত। শহরের সোনাতোর মহল্লার কারুকার্য্যখচিত রাসমঞ্চটি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। বহু দেবমূর্ত্তি ইহাতে খোদিত আছে। শিউড়ীর নিকটবর্ত্তী কালীপুর করিধা নামক পল্লীতে উত্তম তসর ও বাপ্তার কাপড় প্রস্তুত হয়। এই গ্রামে প্রতি বৎসর গোপাষ্টমী উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে।

এ অঞ্চলের যাদুপটুয়া সম্প্রদায় পুরাকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া আসিতেছেন। কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার ছবি আঁকিয়া আত্মীয়দের নিকট গিয়া ইঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী, কৃষ্ণলীলা, রামলীলার ছবিও ইঁহারা আঁকেন।

বীরসিংহপুর—শিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে বীরসিংহপুর গ্রামের পূর্ব্বভাগে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। ইহা রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম অঞ্চল হইতে বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ নামক তিন রাজপুত্র মুসলমান হস্তে তাঁহাদের পিতার মৃত্যু ঘটিবার পর এদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যৌবনে তাঁহারা এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তিন ভ্রাতা তিনটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম বীরসিংহপুর রাখেন। কেহ কেহ বলেন বীরসিংহ জরাসন্ধ বা তাঁহার পুরোহিতের বংশধর। বীরসিংহ তাঁহার রাজধানীতে যে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন লোকে অদ্যাপি তাহা দেখাইয়া থাকে। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ও বীর ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া বীরসিংহপুর হইতে কাটোয়ায় গিয়া গঙ্গাস্নান ও আহ্নিক করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি এত বলশালী ছিলেন যে স্নানের সময় তৈল মাখিবার জন্য দুই হাতে সরিষা পিষিয়া তৈল বাহির করিতেন। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় তিনি পথে নোয়াডিহি নামক স্থানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া তথাকার একটি উচচ ভূখণ্ডকে লোকে আজও বিশ্রামপীঠ বলে।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার গিয়াসুউদ্দীন বীরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ ভ্রাতৃত্রয়ের বীরবিক্রমে তিনি পরাস্ত হন। প্রবাদ, পরে গিয়াসুউদ্দীন কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান এবং ফতেসিংহের

পরামর্শক্রমে রাত্রিবেলায় সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে একদল গাভী রাখিয়া বীরসিংহপুর আক্রমণ করেন। বীরসিংহ এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে আসিয়া দেখিলেন যে অস্ত্রব্যবহার করিতে হইলে গো-হত্যা করিতে হয়। তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া নিজ সৈন্যকে অস্ত্র ক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিলেন। শত্রুসৈন্য বিনা বাধায় সসৈন্যে বীরসিংহকে নিহত করিল। রাজমহিষী নিকটস্থ কালী দীঘিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তদবধি কালীদীঘি "রাণীদহ" বা "রাণীর বাঁধ" নামে পরিচিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী, এই বীরসিংহের নাম হইতেই জেলার নাম বীরভূম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সাঁওতালী ভাষায় বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল এবং পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল বলিয়াই সাঁওতালগণ উহাকে বীর ভূইয়া নামে অভিহিত করিত। বীর ভুইয়া হইতেই বীরভূম শব্দের উৎপত্তি। বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর এইরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। একদা বিষ্ণুপুরের এক রাজা তাঁহার শিক্ষিত বাজপাখীর দ্বারা অন্য পাখী শিকার করিতে বাহির হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া পড়েন। কিছু দূরে একটি বক দেখিতে পাইয়া তিনি বাজপাখীকে উহার উদ্দেশে ছাড়িয়া দিলেন। বকটি কিন্তু পলাইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া বাজপাখীকে প্রতি-আক্রমণ করিল। বাজপাখী পরাজিত হইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল এবং বক পূর্ব্বের ন্যায় আহার অন্বেষণে রত হইল। বাজপাখী অতি সহজেই বক শিকার করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন, যে দেশের পাখী এত সাহসী হয় সে দেশের মানুষ নিশ্চয়ই অতিশয় বীর ও সাহসী হইবে। তিনি সেই জন্য এই অঞ্চলের নাম রাখিলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

বীরসিংহপুরের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের নিকটেই রাজধানীর অপর অংশ জঙ্গলপূর্ণ হইয়া এখন "ভাণ্ডীরবন" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বনে "সিদ্ধনাথ" বা ভাণ্ডেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, রামায়ণে উল্লিখিত বিভাণ্ডক মুনি বহুকাল ধরিয়া এই শিবের পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিবের নাম হয় ভাণ্ডেশ্বর।

রাজনগর—শিউড়ী হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে নগর নামক একটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুউদ্দীনের মৃত্যুর পর বীরসিংহপুরের রাজা বীরসিংহের পলায়িত পুত্র সুযোগ বুঝিয়া বীরসিংহপুরের অনতিদূরে নাগর বা নগর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বীররাজ নাম গ্রহণ করেন। পলায়নকালে তিনি বীরসিংহপুর হইতে কুলদেবতা কালিকা দেবীর মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া আসেন এবং নূতন রাজধানী নগরে কালীদহ নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া উহার তীরে এক মন্দির মধ্যে দেবীমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বীররাজের বংশধরগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নগরে রাজত্ব করেন। বীররাজবংশের পতনের পর কালিকামূর্ত্তি পুনরায় বীরসিংহপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

নগর সম্বন্ধে অন্য জনশ্রুতি এই যে মহারাজ বল্লালসেনের দ্বারা কৃত কোন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ী নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেনপাহাড়ী নাম তাঁহারই নামানুসারে হয়। বর্ত্তমানে সেনপাহাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। সেনপাহাড়ীর নিকটে লক্ষ্মণসেন নিজ নামে

লখ্‌নর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে উহা লখনৌর নগর, নাগর, নগর ও রাজনগর নামে পরিচিত হয়। শেষ বীররাজের পতনের পর রাজনগরে মুসলমান ফৌজদার-গণের প্রতিষ্ঠা হয়। ফৌজদার বাহাদুর খাঁ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজনগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের জন্য রণমস্ত খাঁ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর কালীদহের মধ্যস্থলে একটি হাওয়াখানা এবং রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটি হাম্মাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খাজা কামালের পুত্র দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁ পরম ধার্ম্মিক, দয়ালু ও জ্ঞানী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ সাধু ও ফকিরগণের সেবায় ব্যয় করিতেন এবং বহু দীঘি খনন করাইয়া প্রজাদিগের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের বহুস্থানে চৌকিদারী ঘাঁটি বসাইয়াছিলেন। ঘাঁটির রক্ষী সেনাগণ ঘাটোয়াল নামে অভিহিত হইত। ইহা ছাড়া বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি নগরের চারিদিকে ৩২ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ও প্রায় দশ বার হাত উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নগরের অরণ্য মধ্যে এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁর পুত্র দেওয়ান বাদি উজজ্‌মান খাঁ বিলাসপরায়ণ হইলেও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিবশেষে বহু পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে বীরভূম অঞ্চল রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী নবাব সরকারে ইঁহাকে বার্ষিক ৩,৪৬,০০০৲ টাকা কর দিতে হইত। ইঁহারই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত ও রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে বর্গীদিগের উপর্য্যুপরি অত্যাচারের ফলে এই অঞ্চল বিশেষ উপদ্রুত হয়। বর্গীর অত্যাচার দমনের জন্য ইনি নবাব আলিবর্দ্দীকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বাদি উজজ্‌মান খাঁ একজন ফকিরের সহিত ধর্ম্মালোচনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন এবং রাজকার্য্যের বিশেষ কিছুই দেখিতেন না। ফলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাঁহার দুই পুত্র আহম্মদ উজজ্‌মান খাঁ ও আলিনকি খাঁ গুপ্তঘাতকের দ্বারা ফকিরকে হত্যা করান। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বাদি উজজ্‌মান রাজ্যভার পুত্রগণকে অর্পণ করিয়া আরও গভীরভাবে ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিবিষ্ট হন। আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি খাঁ নিজেরা রাজ্য গ্রহণ না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদ উজজমানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, আসাদের মাতাকে যখন বাদি উজজ্‌মান বিবাহ করেন তখন তিনি ভাবী পত্নীর মাতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। পিতার এই সত্য রক্ষা করিবার জন্য আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি খাঁ স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ পত্র লিখিয়া দেন। পরে দুই ভ্রাতা মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাব সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ইংরেজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি তাঁহার পক্ষে সেনাপতিত্ব করেন। কলিকাতার যুদ্ধে নবাব সৈন্য জয়ী হইলে আলিনকির অধীন সৈন্যগণ কলিকাতা লুঠ করিয়াছিল। রাজনগরের মহরমের শোভাযাত্রায় "লুঠের কাপড়" নামে যে বস্ত্র বাহির করা হয় উহা নাকি আলিনকি খাঁ কলিকাতা লুঠের সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে আলিনকি খাঁর নামানুসারে কলিকাতার আলিপুরের নাম হইয়াছে। আলিনকির বীরত্ব ও সাহসের জন্য লোকে তাহাকে "কলির ভীম" বলিত।

আসাদ উজজ্‌মান খার মৃত্যুর পর হইতে রাজনগরের পতন ঘটে।

খুশতিনগরী—শিউড়ী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ইরাণের কিরমান হইতে আগত সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লা কিরমানী নামক পীরের দরগাহ্ এ অঞ্চলে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়।

রাণীগঞ্জ—হাওড়া হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। কয়লার খনির জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। ইহার চারিদিকের স্থানকে খনির রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কাগজের কল, মাটীর বাসন ও টালির কারখানা, তেলের কল প্রভৃতি বহু কলকারখানা আছে। রাণীগঞ্জ শহরটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

রাণীগঞ্জ শহরের নিকটবর্ত্তী সিয়ারসোল একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে রাজা উপাধিধারী একঘর পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস।

রাণীগঞ্জ হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে দামোদর নদের অপরপারে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মেঝিয়া গ্রামে প্রচুর গালা প্রস্তুত হয়। মেঝিয়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে ভুলুই গ্রামে আড়াইশত বৎসরের উপর হইল জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এবং ইঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায় মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ছাড়া জগৎ-রাম "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামে শিবদুর্গার দাম্পত্য-কলহের একখানি সুন্দর অম্লমধুর কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদও "কৃষ্ণলীলামৃতরস" নামে একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন।

আসানসোল জংশন—হাওড়া হইতে ১৩২ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা এবং খনি অঞ্চলের প্রধান শহর। রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল ও এখানে লুণ্ঠনবৃত্তিধারী চুয়াড় প্রভৃতি জাতি বাস করিত। বর্ত্তমানে ইহা আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার নিদর্শনপূর্ণ সমৃদ্ধ শহর। বিখ্যাত গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড এই শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বভারত রেলপথের একটি প্রসিদ্ধ বিভাগীয় সদর। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পুরুলিয়া ও আদড়া হইয়া এখানে আসিয়া মিলিয়াছে।

সীতারামপুর জংশন—হাওড়া হইতে ১৩৮ মাইল দূর। ইহা রাণীগঞ্জ ও বরাকরের কয়লার খনির প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন বাহির হইয়াছে ও অণ্ডাল হইতে একটি ছোট লুপ শাখা আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে।

প্রধান লাইনের উপর সীতারামপুর জংশনের পরের স্টেশন রূপনারায়ণপুর। ইহা হাওড়া হইতে ১৪৫ মাইল দূর এবং বর্দ্ধমান জেলার ও বাংলা দেশের শেষ রেলস্টেশন। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রূপনারায়ণপুর অতিক্রম করিবার পর গাড়ী সাঁওতাল পরগণার এলাকায় পড়ে। এই অঞ্চলে বহুদিন হইতেই বাঙালীর বসবাস আছে। বস্তুতঃ বাঙালীরা গিয়া দলে দলে এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতেই এই অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এদিককার সাধারণ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই পাহাড় পর্ব্বত, পার্ব্বত্য নদ নদী শোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর, পর্ব্বতগাত্রে ও প্রান্তরে শাল, মহুয়া, আম, জাম ও নিম প্রভৃতি বৃক্ষের শোভা ও মনোহরম পুষ্পবীথিকা দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের ঢেউএর মত এখানকার মাটি যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে দীঘি বা পুষ্করিণী বড় একটা নাই। কূপের জলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মিহিজাম, জামতাড়া, কর্ম্মাটাড়, মধুপুর, জগদীশপুর, গিরিডি, জসিডি, দেওঘর, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান বাঙালীর স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বহু কলিকাতাবাসী বাঙালীর

বাড়ী আছে। পূজা ও বড়দিন উপলক্ষে দলে দলে বাঙালীরা বায়ু পরিবর্ত্তন ও ছুটি উপভোগের জন্য এই অঞ্চলে আসিয়া থাকেন।

কর্ম্মাটাড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাসভবন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল অধ্যুষিত এই পল্লীতে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাকেই অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

মধুপুর একটি জংশন স্টেশন। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ১৮৩ মাইল। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ও বঙালীবহুল শহর। আগন্তুকদিগের অবস্থানের জন্য এখানে ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস গিরিডি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা লাইনের জগদীশপুর ও গিরিডিতে বহু বাঙালীর বাস।

মধুপুরের পরবর্ত্তী স্টেশন জসিডি জংশন হাওড়া হইতে ২০১ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথদেবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য ও প্রসিদ্ধি আছে। এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রির সময়। বৈদ্যনাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গনে অন্নপূর্ণা, কালী, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও আনন্দভৈরব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। শহরের মধ্যস্থ শিবগঙ্গা সরোবর ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এবং শহরের উপকণ্ঠস্থ নন্দন পাহাড় ও শহর হইতে যথাক্রমে পাঁচ ও এগারো মাইল দূরে অবস্থিত "তপোবন" ও "ত্রিকূট" পাহাড় বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। তপোবন ও ত্রিকূট পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

বৈদ্যনাথের দই, পেড়া, পেঁপে ও গোলাপফুল প্রসিদ্ধ।
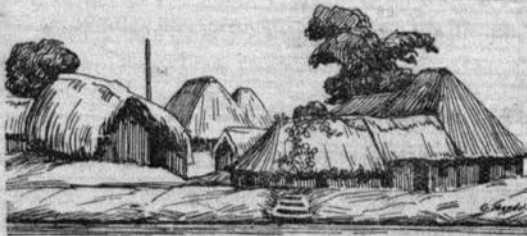
(খ) হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইন ও তারকেশ্বর শাখা।

কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাইবার জন্য এই কর্ড বা সোজা লাইনটি নির্ম্মিত হয়। এই লাইনটি বেলুড় স্টেশনের পর হইতে পৃথক্ হইয়া বদ্ধমানের দুই স্টেশন পর্ব্ববর্ত্তী শক্তিগড়ে মেন বা প্রধান লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধান লাইনের শেওড়াফুলি জংশন হইতে একটি শাখা এই লাইনের কামারকুণ্ডু স্টেশন হইয়া তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

জৌগ্রাম—হাওড়া হইতে কর্ড লাইনে ৪১ মাইল দূর। জৌগ্রাম স্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে কুলীনগ্রাম। ইহা কর্ড লাইনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। প্রধান লাইনের মেমারি স্টেশনে নামিয়াও এই স্থানে যাওয়া যায়। মেমারি হইতে কুলীনগ্রাম ৫ মাইল দূর।

কুলীনগ্রাম একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। ইহা বসু রামানন্দ ঠাকুরের পাট নামে প্রসিদ্ধ। কুলীনগ্রামের পরম বৈষ্ণব বসু বংশের খ্যাতি বৈষ্ণব সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত দশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন এই বংশীয় মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য রচনা করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলা ভাষার আদি কাব্য। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়। কবি মালাধর গৌড়েশ্বর সামস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহের নিকট হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে মালাধর লিখিয়াছেন :—

"বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥
যক্ষ রক্ষ সর্ব্বজনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥"
"গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"
"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের বন্দনার দ্বিতীয় পদটি এইরূপ :—

"এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥"

এই পদটি চৈতন্য দেবের অতি প্রিয় ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের উক্তি যথা :—

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তঁহি তাঁর বাক্য এক আছে প্রেমময়॥
'নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥"

কুলীনগ্রাম এবং এই বসু বংশকে চৈতন্যদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন ও প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন।

গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান (প্রকৃত নাম লক্ষ্মীকান্ত) ও তৎপুত্র বসু রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। কুলীনগ্রামবাসিগণের একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল, পুরীতে রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেব যখন নৃত্য করেন, তখন এই কুলীনগ্রামের কীর্ত্তন সমাজও তথায় নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

একবার জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার সময় একটি পট্টডোরী বা রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পট্টডোরীর ছিন্ন অংশ লইয়া রামানন্দ বসুর হাতে দিয়া বলেন—

"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥"

সেই হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কুলীনগ্রামের বসুবংশ জগন্নাথদেবের পট্টডোরী যোগাইয়া আসিতেছেন। আজিও কুলীনগ্রাম হইতে পট্টডোরী না পৌঁছানো পর্য্যন্ত পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানা হয় না। বসু রামানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার নামের ভনিতাযুক্ত কতকগুলি সুন্দর পদ আছে।

"যবন হরিদাস" নামে পরিচিত পরম ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বহু দিন কুলীনগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে কুলীনগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রসার ঘটে।

"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

কুলীনগ্রামের দক্ষিণাংশে যে নির্জ্জন স্থানে হরিদাস ঠাকুর সাধন ভজন করিয়াছিলেন উহা হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী নামে পরিচিত। এই পাটবাড়ীর মন্দিরে গৌরাঙ্গদেব ও হরিদাস ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কেলিকদম্ব তলে হরিদাস ঠাকুর উপবেশন করিতেন উহা আজিও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে যে চৈতন্যদেব এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গদেবের আগমন স্মরণ ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে মেলা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কুলীনগ্রামে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। উহার মধ্যে শিবানীদেবী, গোপেশ্বর মহাদেব, মদন-গোপালজীউ ও গোপীনাথের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। আদ্যাশক্তি শিবানীদেবীর মূর্ত্তি পাষাণময়ী। মন্দির গাত্রের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ৯৬৩ শকে অর্থাৎ ১০৪১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবানী মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া লুপ্তস্রোতা কংস নদীর খাত দেখা যায়।

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির কুলীনগ্রামের বিখ্যাত সরোবর গোপালদীঘির নৈঋত কোণে অবস্থিত। এই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৬৬৬ শকে কুলীনগ্রামের অন্তর্গত চৈতন্যপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই মন্দিরের সংস্কার করেন। সুতরাং মন্দিরটি যে ইহার অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

চৈতন্যপুর কুলীনগ্রামবাসী বসুবংশের অন্যতম বাসস্থল ছিল। চৈতন্যদেবের নামানুসারেই যে স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে গড় ছিল। সাধারণ লোকে আজিও ইহাকে "রামানন্দ ঠাকুরের গড় বাড়ী" নামে অভিহিত করে।

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অলিন্দে একটি কষ্টিপাথরের বৃষ আছে। বৃষটি প্রায় দেড় হাত লম্বা ও এক হাত উচ্চ। ইহার গলকম্বলে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে সত্যরাজ খান এই বৃষের প্রতিষ্ঠাতা। বৃষটির কারুকার্য্য অতি সুন্দর।

শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট একটি বিরাট মেলার অধিবেশন হয়।

বসুবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কুলীনগ্রাম সম্ভবতঃ শক্তি উপসনার কেন্দ্র ছিল। আদ্যা জননী শিবানীদেবীর মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মালাধর, লক্ষ্মীকান্ত ও রামানন্দ বসুবংশের এই তিন কীর্ত্তিমান পুরুষ হইতেই কুলীনগ্রামের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহাদেরই কৃতিত্বে কুলীনগ্রাম তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে বসু রামানন্দকে চৈতন্যদেব "সখা" সম্বোধন করিতেন।

মদন গোপাল, রঘুনাথ, কৃষ্ণরায়, গোপীনাথ, গোবিন্দ, জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির বসুবংশের অমর কীর্ত্তি। রথ ও দোলযাত্রা উপলক্ষে মদন গোপাল, গোপীনাথ ও জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ সমারোহ হয় এবং নানাস্থানে হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

জৌগ্রাম স্টেশন হইতে একটি আকাশচুম্বী শিবমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহা জলেশ্বর শিবের মন্দির নামে পরিচিত। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে এই শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। "যোগগ্রাম" হইতে জৌগ্রাম নাম হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন।

সিঙ্গুর—তারকেশ্বর শাখা লাইনে শেওড়াফুলি ও কামারকুণ্ডু জংশনের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ২১ মাইল। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এই স্থানের প্রাচীন নাম সিংহপুর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানেই বঙ্গরাজ সিংহবাহুর রাজধানী ছিল। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশ" পাঠে জানা যায় যে সুপ্রদেবী নামে একটি বাঙালী রাজকন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাথ সিংহ নামে এক সার্থপতিকে পতিত্বে বরণ করেন। ইঁহাদের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবংশে এই রাজ্য "লাড়রট" অর্থাৎ রাঢ়রাষ্ট্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহবাহু স্বীয় ভগিনী সিংহশীবলিকে মহিষী করিয়াছিলেন। এই সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সাত শত বীর সহচর সমভিব্যাহারে জাহাজে করিয়া তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন এবং উহা জয় করেন। তদবধি লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে দিন দেহত্যাগ করেন, বিজয়সিংহ ঠিক সেই দিনেই লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন।

সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি উচ্চ স্থান ও জাঙ্গাল প্রভৃতি দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সিঙ্গুরের বসুমল্লিক বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। এই বংশের সুসন্তান পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি আই ই মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে রেল স্টেশনের নিকট স্বীয় পিতার নামে আধুনিক প্রথায় সুসজ্জিত হাঁসপাতাল ও মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হরিপাল—তারকেশ্বর শাখা লাইনে কামারকুণ্ডু জংশন ও তারকেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে দূরত্ব ২৮ মাইল। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও

অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানেড়ার বীরত্ব কাহিনী মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল কানেড়ার সৌন্দর্য্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত থাকিলেও কানেড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। ধর্ম্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া কানেড়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ভাটকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল বা হরিপাল আক্রমণ করিলে পুরবাসীসহ রাজা হরিপাল দূরে পলায়ন করেন। একমাত্র দাসী ধুমসীকে সঙ্গে লইয়া বীরবালা কানেড়া রণসাজে সজ্জিত হইয়া গৌড় সেনাবাহিনীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণসজ্জা দেখিয়া গৌড়াধিপের সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করিল। তখন সম্মুখবর্ত্তী বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালকে সম্বোধন করিয়া কানেড়া বলিলেন যে তাঁহার একটি পণ আছে যে, যে ব্যক্তি তরবারির একচোটে একটি লৌহ নির্ম্মিত গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। এই দুষ্কর কার্য্য স্বীয় শক্তির সাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া গৌড়েশ্বর গৌড় হইতে সেনাপতি লাউসেনকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মের বরপুত্র লাউসেন তরবারির একচোটে লৌহ গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা রাজপুত্রীকে বলিলেন যে তাঁহার প্রভু গৌড়েশ্বরের আদেশক্রমেই তিনি এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, সুতরাং কানেড়ার বরমাল্য ধর্ম্মপালের কণ্ঠেই শোভা পাওয়া উচিত। কানেড়া তাঁহার এই যুক্তি না শুনিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

তারকেশ্বর—হাওড়া হইতে ৩৬ মাইল দূর। বাংলাদেশে একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের ন্যায় বিখ্যাত শৈবতীর্থ আর নাই। তারকনাথ শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে স্থানে বর্ত্তমান মন্দিরটি অবস্থিত, পূর্ব্বে উহা জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিকের নিম্নভূমি নল ও খাগড়ায় পূর্ণ ছিল। উচ্চ ভূভাগ সিংহলদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই দ্বীপের অরণ্যমধ্যে পাষাণময় তারকনাথ বিরাজিত ছিলেন। কথিত আছে, গ্রাম্য স্ত্রীগণ শিবলিঙ্গকে সামান্য পাষাণখণ্ড-জ্ঞানে উহার উপর ধান ভানিত। ইহার ফলে শিবলিঙ্গের উপরিভাগে একটি গর্ত্ত হইয়া যায়। এই গর্ত্ত আজও তারকনাথের মাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তারকনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে কথিত আছে যে মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ একদিন সবিস্ময়ে দেখিতে পায় যে তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী জঙ্গলমধ্যে একখণ্ড পাষাণের উপর দুগ্ধবর্ষণ করিতেছে। সেইদিন রাত্রিকালে তারকনাথদেব স্বপ্নযোগে মুকুন্দ ঘোষকে নিজের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করেন এবং তাহাকে বলেন সে যেন সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুকুন্দ ঘোষ হইতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ এবং এবং মুকুন্দই তাঁহার প্রথম সেবক। তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি বিরাজিত আছে। যাত্রিগণ এই স্থানেও পূজা দিয়া থাকেন। হুগলী জেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশীয় রাজা ভারামল্ল বা বরাহমল্ল মুকুন্দ ঘোষের আবিষ্কৃত তারকনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা ভারামল্ল সংসার ত্যাগ করিয়া তারকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার পূজার জন্য সন্ন্যাসী মহান্ত নিযুক্ত করেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভারামলপুর গ্রাম আজও এই ত্যাগী নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। ভারামল্লের পর বর্দ্ধমানরাজও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং দেবসেবার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই প্রকার দানের ফলে তারকনাথদেবের

বহু ভূসম্পত্তি হয়। মুকুন্দ ঘোষের পর দশনামী সম্প্রদায়ভক্ত "গিরি" উপাধিধারী সন্ন্যাসীগণ তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ লাভ করেন। সম্প্রতি পশ্চিম দেশীয় এই মোহান্ত সম্প্রদায়কে অপসারিত করিয়া দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ নামক জনৈক বাঙালী সন্ন্যাসীকে মোহান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে দুধ পুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুকুরে স্নান করিয়া যাত্রিগণ তারকনাথের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। নিকটেই অপর একটি মন্দিরে দশভুজা দেবী বিরাজিতা আছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় বহু নরনারীকে ধর্ণা দিতে দেখা যায়।

তারকেশ্বর তীর্থে পূর্ব্বে যে সকল অনাচার ছিল তাহা এখন দূরীভূত হইয়াছে। এই স্থানকে এখন একটি আদর্শ তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঁধানো রাস্তা, নলকূপের জল, উজ্জ্বল আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের আর কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে একটি ধর্ম্মশালা ও পাণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত বহু যাত্রীনিবাস আছে।

তারকেশ্বরে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময়। এই উপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়।

তারকেশ্বর একটি জংশন স্টেশন। এখান হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথের ছোট গাড়ীতে করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত দশঘরা, ধনিয়াখালি, মগরা প্রভৃতি হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দশঘরা হইতে অপর একটি শাখা লাইন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘি ও জামালপুর-গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(গ) ব্যাণ্ডেল—বারহাড়োয়া লুপ শাখা।

বংশবাটী—হাওড়া হইতে ২৮ ও ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩ মাইল দূর। এই স্থানের চলিত নাম বাঁশবেড়ে। রায় মহাশয় উপাধিধারী এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশের জন্য এই স্থানের প্রসিদ্ধি। এই বংশের আদিপরুষের নাম রামেশ্বর রায়চৌধুরী। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে "রাজা মহাশয়" উপাধি লাভ করেন। সেই হইতে তাঁহার বংশধরগণ রায় মহাশয় নামে খ্যাত। রাজা মহাশয়গণের গড়-বেষ্টিত বাটী এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। এই গড়ের মধ্যে বাসুদেব স্বয়ম্বরা কালী, সুপ্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী, ও চতুর্দ্দশেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। হংসেশ্বরীর মন্দিরের অনুরূপ মন্দির বাংলাদেশে আর একটিও নাই। ছয়তল ও ত্রয়োদশ চূড়া সমন্বিত ৭০ ফুট উচচ এই মন্দিরটি বারাণসীর স্থাপত্য শিল্পের আদর্শে নিম্মিত। ইহার গঠন প্রণালীতে যৌগিক ষট্‌চক্রভেদের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নরদেহে ষট্‌চক্রভেদের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে যে পাঁচটি নাড়ী আছে, সেরূপ এই মন্দিরে উহাদের প্রতীক পাঁচটি সোপান আছে এবং হংসেশ্বরী দেবী কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা। বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং তৎপত্নী রাণী শঙ্করীদেবী কর্ত্তৃক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পনু হয়। এই মন্দির নির্ম্মাণে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। লুপ্ত বিষয় উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা নৃসিংহদেব ব্যয় সঙ্কোচের জন্য রাজধানী বংশবাটী হইতে কাশীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সেখানে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদে তিনি খিদিরপুর ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং স্বয়ং "উদ্দিশতন্ত্রের" বঙ্গানুবাদ করেন। শাস্ত্রালোচনা ও যোগসাধনার ফলে নৃসিংহদেবের বিষয় বাসনা তিরোহিত হইয়া যায় এবং সংগৃহীত অর্থ মামলা-মোকদ্দমায় ব্যয় না করিয়া হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণে তিনি উহা ব্যয় করেন। হংসেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নিমকাঠের দ্বারা প্রস্তুত দেবীর বর্ণ নীল, শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের উপর দেবী উপবিষ্টা। মন্দিরের দক্ষিণ অর্থাৎ সম্মুখভাগের বারান্দায় ১২টি কারুকার্য্যখচিত খিলান আছে। মধ্যভাগের চূড়াটি প্রায় ৭০ ফুট উচচ। মন্দিরের ছাদে উঠিবার জন্য তিনটি সিঁড়ি আছে। ছাদের উপর হইতে অদূরবর্ত্তী গঙ্গার দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বাসুদেব মন্দিরটি বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নিম্মিত হয়। এই মন্দিরের ছাদে একটি বড় গুম্বজ আছে এবং সম্মুখ ভাগের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর বহু পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন বাংলার শিল্প-নিদর্শন হিসাবে ইহাও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

বংশবাটী এক সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখানে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে নীলের চাষ হইত। সুসাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকে বর্ণিত নীলকুঠি বাঁশবেড়েয় অবস্থিত ছিল।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বংশবাটীর অধিবাসী ছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বেদান্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে বহু অভিভাবক ছাত্রদের বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লন। বিদ্যালয়টি পরে উঠিয়া যায়।
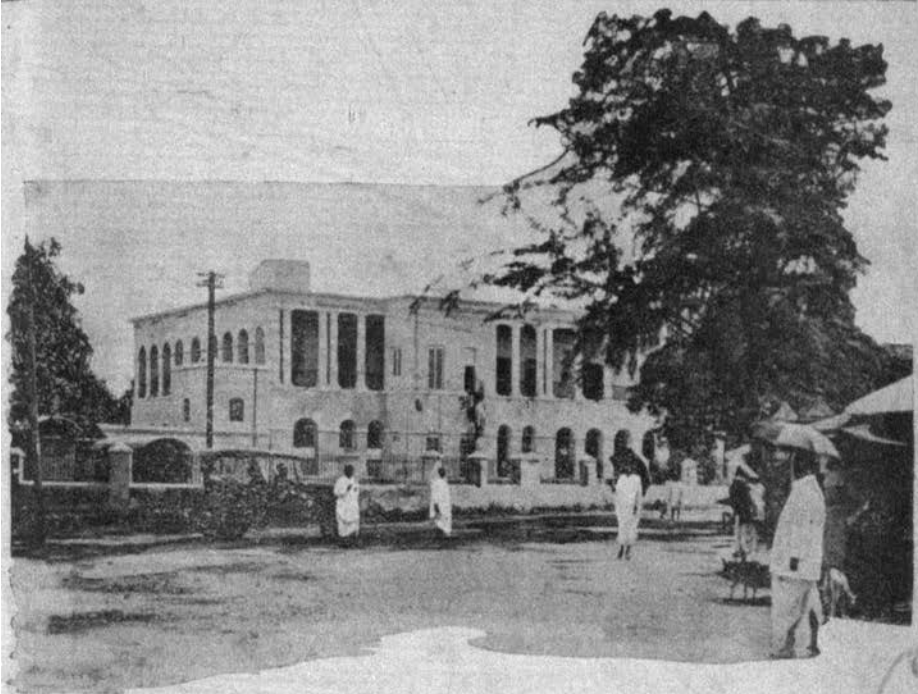
ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যারাক, চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৭৩)
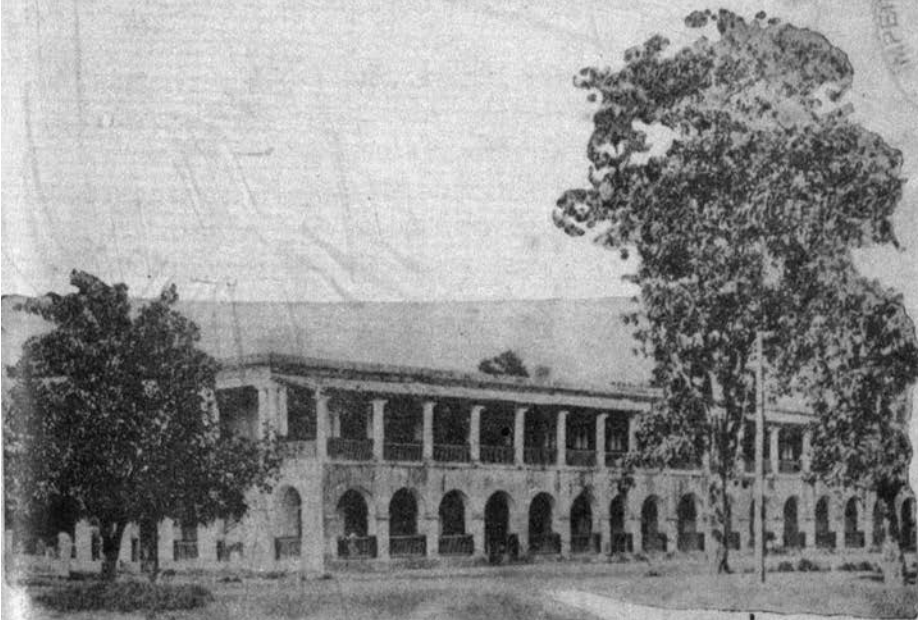
মহশীন কলেজ, হুগলী (পৃষ্ঠা ৭৩)
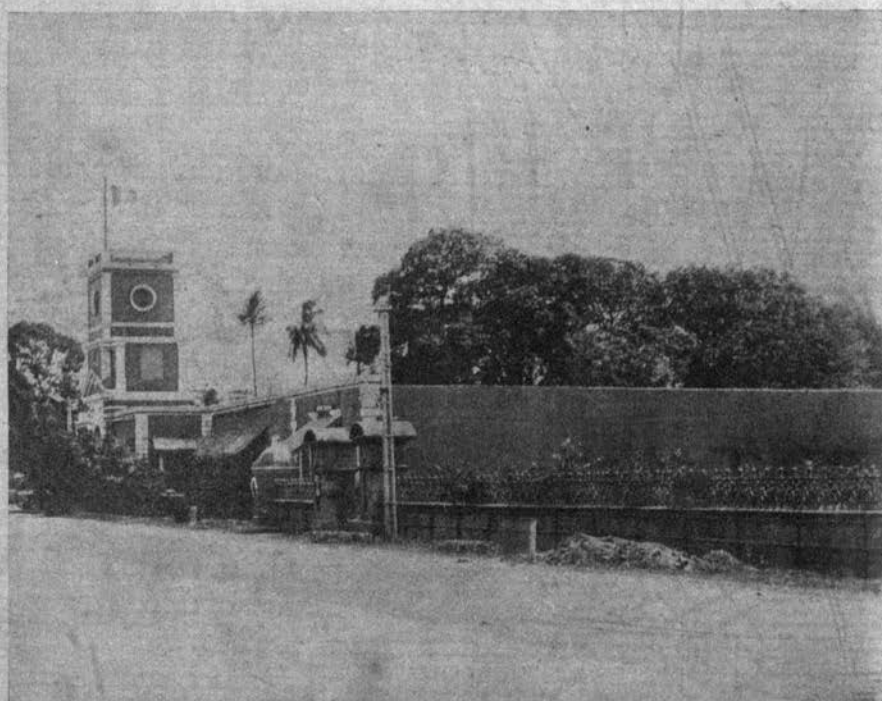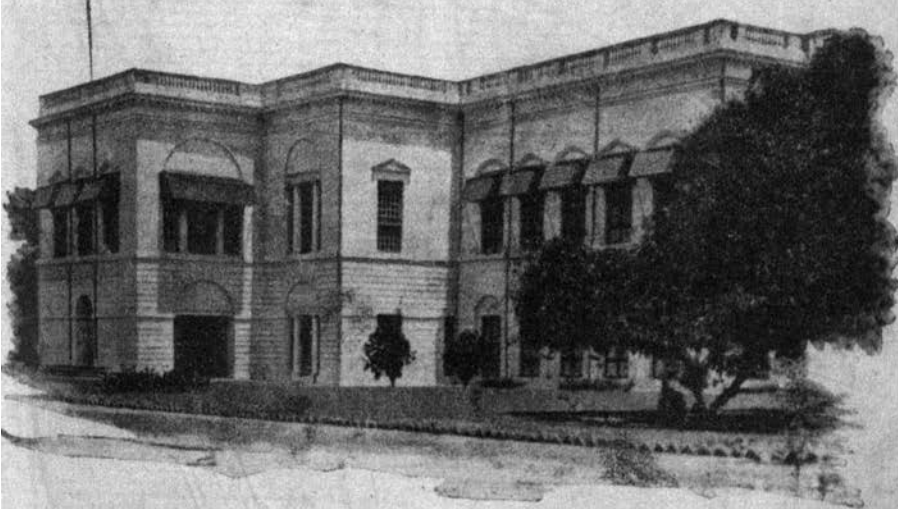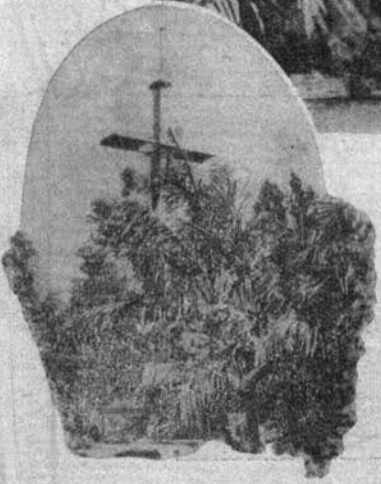
ফোর্ট দ্য আরলাঁ, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)

আদালত ভবন, চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৭৩)

ইমামবাড়া, হুগলী (পৃষ্ঠা ৭৫)

কুঞ্জ, উৎসর্গীকৃত মাস্তুল, ব্যাণ্ডেল গির্জার অভ্যন্তর ও ব্যাণ্ডেল গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৭)
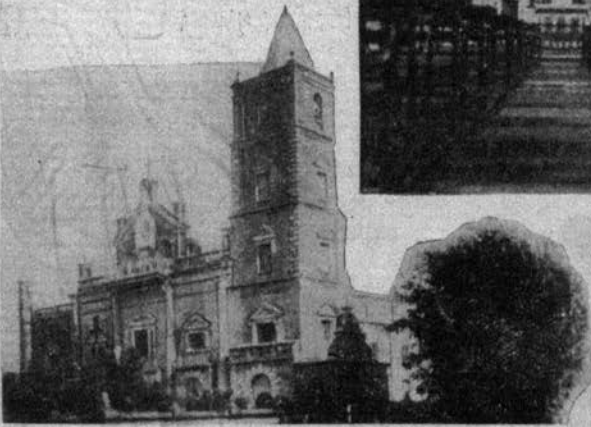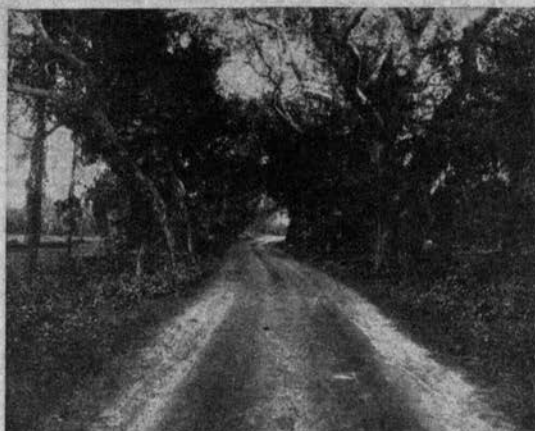
গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোড, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৮)
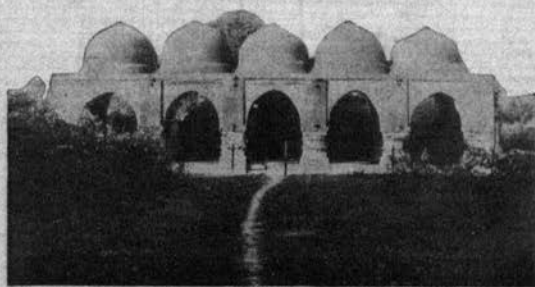
জাফর খাঁর মস্‌জিদ্‌, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭)

উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)

প্রাচীন কবর, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)

স্টার অফ ইণ্ডিয়া তোরণ, বৰ্দ্ধমান (পৃষ্ঠা ৮২)
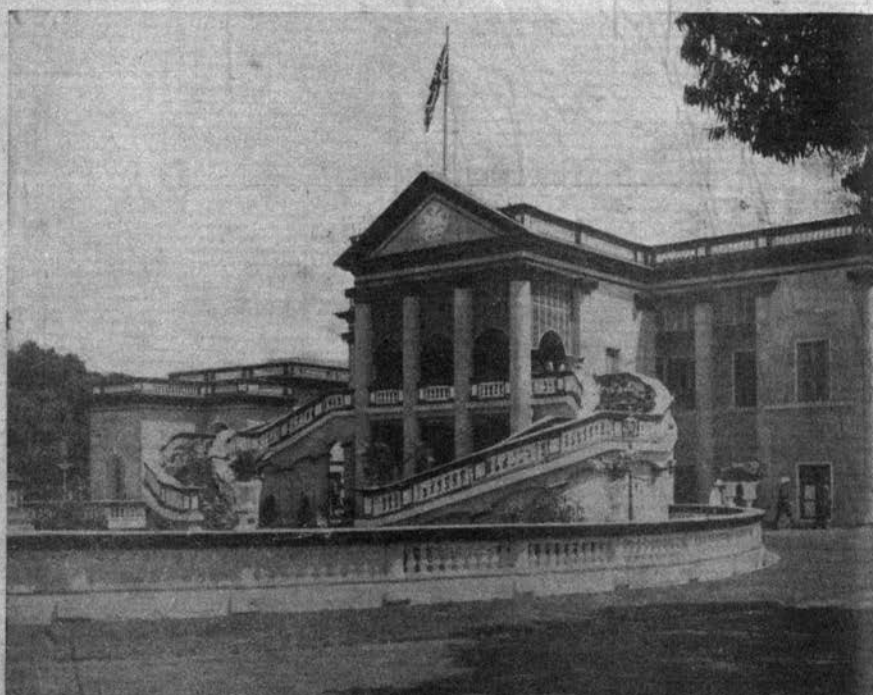
দিলখোসবাগ, বর্দ্ধমান (পৃষ্ঠা ৮২)

বাঁশবেড়িয়ায় বহুপূর্ব্বে একটি গির্জা ছিল; ইহার আচার্য্য ছিলেন ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষাবিদ তারাচাঁদ নামে একজন দেশীয় লোক। কেহ কেহ বলেন এই গির্জাটিই বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম গির্জা।

বাঁশবেড়িয়ায় খামারপাড়ায় একটি আখ্ড়া আছে; হুগ্‌লীর চতুরদাস বাবাজীর বড় আখ্ড়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। খামারপাড়ার আখ্ড়ার প্রতিষ্ঠাতা ভিখারীদাস সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন সকালে ভিখারীদাস যখন দন্তধাবন করিতেছিলেন ত্রিবেণীর দরাফগাজী ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভিখারীদাস যে দাওয়ায় বসিয়াছিলেন তাহাকে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া আগাইয়া যাইতে বলিলেন। দাওয়া আগাইয়া যাইলে ভিখারীদাস দরাফ গাজীর সম্মুখস্থ হইলেন এবং উভয়ে নামিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কথিত আছে ইহার পর দরাফগাজী সংস্কৃত ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গঙ্গা স্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। দরাফগাজী ত্রিবেণীর জাফর খাঁ বলিয়া কথিত।

ত্রিবেণী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও মুক্তবেণী নামে পরিচিত। যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পুনরায় পৃথক ধারায় প্রবাহিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সেই জন্য এই স্থানকে মুক্ত বেণী বলা হয়। ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান হিন্দু মাত্রেরই কাম্য। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ধোয়ী কবির "পবন দূতম" নামক কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে "তিরপানি" ও "ফিরোজাবাদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গাধিপ ফিরোজ শাহ কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলের কীর্ত্তির মধ্যে ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ্ উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদের প্রাচীর গাত্রে আরবী ভাষায় কোর-আনের বচন উৎকীর্ণ আছে। অদিসপ্তগ্রাম দ্রষ্টব্য।

মুঘল আমলে ত্রিবেণী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহর ছিল এবং তীর্থ হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥"

ত্রিবেণীতে ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের নির্ম্মিত একটি পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে।

সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফর খাঁ ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থলে একটি পুরাতন প্রস্তরের দেব মন্দিরের মধ্যে সমাহিত আছেন। সমাধির নিকটে একটি বৃহৎ মসজিদ; ইহা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত। মসজিদের একটি খিলান মস্‌জিদ অপেক্ষাও প্রাচীন ও জাফর খাঁ নির্ম্মিত পূর্ব্বেকার মস্‌জিদের মিহরাব। এই মিহরাবটি বর্ত্তমান মস্‌জিদের অন্য মিহরাব হইতে দেখিতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মিহরাবটি বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার মুসলমান রাজত্বকালের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শন। জাফর খাঁর মসজিদটি ভাঙ্গিয়া গেলে বর্ত্তমান মস্‌জিদ নির্ম্মাণকালে এই পুরাতন মিহরাবটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রিবেণী তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি হারাইলেও তীর্থ গৌরব হারায় নাই। যাঁহারা প্রয়াগের যুক্ত বেণীতে স্নান করেন, তাঁহারা ত্রিবেণীর মুক্ত বেণীতে স্নান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন। দশহরা, বারুণী, মকরসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ও গ্রহণ উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার বেণীমাধবের মন্দিরে বহু যাত্রী দেবদর্শন ও দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে লোকে বহুদূর হইতে শবদাহ করিতে আসে।

নবদ্বীপের ন্যায় ত্রিবেণীও এককালে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশবিশ্রুত শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যে একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তিনি সন্ধ্যা করিতেছেন এমন সময় নৌকাযোগে দুইজন গোরা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি করে। জগন্নাথ ইংরেজী আদৌ জানিতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া গোরা দুইটির ইংরেজী বাদানুবাদ অবিকল বলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঘাটি গ্রাম হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা ছাত্র বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের পৈতৃক বাসস্থান। রামগোপাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমসাময়িককালে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং দেশের হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তির জন্য লোকে তাঁহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ডবার্কের সহিত তুলনা করিত। এক সময়ে কলিকাতার নিমতলাস্থ শ্মশান ঘাটে শবদাহ বন্ধ করিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাব হয়। রামগোপাল বাক্‌পটুতা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে গঙ্গাগর্ভে হিন্দুর শব সৎকারের এই অধিকার অক্ষুন্ন রাখেন। নিমতলার শ্মশান ঘাটে তাঁহার একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত স্মৃতি-ফলক আছে।

বাঘাটি গ্রামে "ডাকাতে কালী" নামে এক প্রাচীন কালী আছেন। প্রবাদ, ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বলাগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন সংযুক্ত এক চণ্ডীমন্দির আছে। উহা বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। বলাগড়ের রাধাগোবিন্দ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানকার চণ্ডী মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। নিত্যানন্দের দুহিতা ৺গঙ্গাগোস্বামিনীর বংশধরগণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীপাট বলিয়া সম্মানিত। বাংলার বরেণ্য সন্তান পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল বলাগড়ে।

গুপ্তিপাড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। অনেকে অনুমান করেন যে ইহার পূর্ব্বনাম গুপ্তপল্লী। এই স্থানে বহু প্রাচীন দেবালয় আছে। তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও চৈতন্যদেবের মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং ইহার কারুকার্য্য অতি অপূর্ব্ব। লাল ইটে নির্ম্মিত মন্দির গাত্রে দেব দেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ঘটনাবলী ও বৈষ্ণবদিগের আখ্যান উৎকীর্ণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক ইহা নিৰ্ম্মিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মন্দির মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দারুময়ী মূর্ত্তি আছে। ইহা গুপ্তিপাড়ার মঠ নামে পরিচিত। এখানে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। চৈতন্যদেবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত হয়। ইহার আকৃতি জোড় বাংলার ন্যায়। এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও আড়ম্বরবিহীন। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ও পুনর্যাত্রার সময় গুপ্তিপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়।

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অন্যান্য প্রাচীন স্থানের ন্যায় গুপ্তিপাড়ায়ও বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে "শ্যামাকল্পলতিকা" প্রণেতা ৺মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" প্রণেতা ৺চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের খ্যাতনামা বক্তা ও ধর্ম্মোপদেশক ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তিপাড়ার সন্নিকটে ভাগীরথী তীরে সুখুরিয়া গ্রামে উলার বিখ্যাত মুস্তৌফী বংশের এক শাখার বাস। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়গুলিও এ অঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কালনা কোর্ট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৬ মাইল দূর। ইহা বৰ্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। মুসলমান আমলে এই স্থান অতি সমৃদ্ধ ছিল। এখনও এখানে একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কালনায় বদর সাহেব ও মজলিস্ সাহেব নামক দুইজন ফকিরের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেরা এই সমাধি দুইটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ও ফুল, ফল, মিষ্টান্ন ও ছোট ছোট মাটির ঘোড়ার অর্ঘ্য দান করেন। কালনায় বৰ্দ্ধমান মহারাজের গঙ্গাবাসের জন্য একটি প্রাসাদ ও ১০৯টি শিব মন্দির আছে। বর্ত্তমানে উহাই কালনার একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু। এই মন্দিরগুলি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হয়। প্রাসাদের মধ্যে একটি শিবের, দুটি কৃষ্ণের ও আরও কয়েকটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত মন্দির আছে। রাজপ্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী সমাজ বাড়ীতে বৰ্দ্ধমান রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের চিতাভস্ম ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কালনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত সুমিষ্ট শ্যামা-সঙ্গীত রামপ্রসাদী গানের মত জনপ্রিয়।

কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকা গ্রাম বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের একটি বিখ্যাত তীর্থ। ইহা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট। গৌরীদাস গৌরাঙ্গদেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নিম্বকাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত গৌর নিতাইএর বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া নিত্য সেবা প্রকাশ করেন। গৌরীদাসকে মহাপ্রভুর স্বহস্ত প্রদত্ত উপঢৌকন "গীতা" ও নৌকা বাহিবার একখানি "বৈঠা" শ্রীপাট অম্বিকায় অতি সমাদরে রক্ষিত আছে। অম্বিকা বাজারের নিকটে "শ্রীনাম ব্রহ্ম" নামক অপর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে ভগবানদাস বাবাজী নামক এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর সমাধি আছে। প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীপাট অম্বিকায় বৈষ্ণবগণের মহোৎসব হয়।

অম্বিকা গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, যে প্রাচীনকালে এই স্থানে অম্বরীষ নামক জনৈক ঋষি প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘটস্থাপনা করিয়া দেবী অম্বিকার পূজা করিতেন। দেবীর নাম

হইতেই গ্রামের নাম অম্বিকা হয়। গ্রামের মধ্যভাগে আজিও অম্বিকা পুষ্করিণী নামে একটি জলাশয় ও ঋষি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে।

বাঘনাপাড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৯ মাইল। ইহাও একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট। এখানে গোপেশ্বর নামক এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীউর মন্দির আছে। পরম বৈষ্ণব রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতিবৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ও রামকৃষ্ণ জীউর দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির দিন গোপেশ্বর শিবের মন্দিরেও বহু ভক্তের আগমন হয়। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর পোষ্যপুত্র রামচন্দ্র বা রামাই গোঁসাই বৃন্দাবন হইতে কানাই-বলাই বা রামকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। "বংশী শিক্ষা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘ বাস করিত। রামচন্দ্র গোস্বামী এই বাঘকেও হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন এবং বাঘের নামানুসারে গ্রামের নাম বাঘনাপাড়া রাখেন।

সমুদ্রগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহা প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে ইহা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখন ভাগীরথী দূরে সরিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাভারতোক্ত বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আবার কাহারও কাহারও মতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সহিত এই স্থানের সম্বন্ধ ছিল; এখানে তাঁহার গড় ও স্থানীয় রাজধানী ছিল এবং কাহারও কাহারও মতে মহাকবি কালিদাস ইঁহার নিকটেই বাস করিতেন। মকুট রায় নামে সমুদ্রগড়ের একজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ রাজার প্রসিদ্ধি আছে। পাঠান জায়গীরদারদের সহিত তাঁহার বহুবার যুদ্ধ হয় এবং শেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোটের উপর স্থানটি যে খুব প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

অনেকে অনুমান করেন যে বাংলা দেশের আদি সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সপ্তশতী নামক পরগণায় বাস করিতেন। সমুদ্রগড়ের বর্ত্তমান পরগণা সাতসইকা ও সপ্তশতী অভিন্ন বলিয়া অনেকের অভিমত।

নবদ্বীপধাম—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪১ মাইল দূর। স্টেশন হইতে নবদ্বীপ শহর প্রায় দুই মাইল। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। আশে পাশের সমস্ত স্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হইলেও নবদ্বীপ শহরটি গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নদীয়া জেলার অধীন। বস্তুতঃ নবদ্বীপ হইতেই "নদীয়া" নামের উৎপত্তি। সুতরাং নবদ্বীপকে বাদ দিয়া নদীয়া জেলা হইতে পারে না। নবদ্বীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ প্রমাণাদি নাই। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণের গঙ্গাবাস স্থান স্বরূপ নবদ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার নামকরণ সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন গঙ্গার গর্ভ হইতে নূতন উত্থিত হওয়ায় ইহার নাম হয় নূতন বা নবদ্বীপ; কাহারও কাহারও মতে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে রাত্রিকালে নয়টি আলোক জ্বালিয়া যোগসাধনা করিতেন বলিয়া ইহাকে "নবদ্বীপ" বা "নদীয়া" বলা হইত। অধিকাংশের

মতে গঙ্গা গর্ভোত্থিত এই পবিত্র ভূমি নয়টি দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া ইহার নাম হয় নবদ্বীপ। নবদ্বীপের উপর যাঁহাদের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই বৈষ্ণবগণ এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। "নবদ্বীপ পরিক্রমা" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

" নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

এই নয়টি দ্বীপের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

" গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

বর্ত্তমান নবদ্বীপের আশে পাশে ও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে প্রাচীন নয়টি দ্বীপের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় এবং এই সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ "নবদ্বীপ পরিক্রমা" উৎসব সম্পন্ন করেন।

সেন রাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব কালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। " চৈতন্য ভাগবত " কার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,

" নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥"
" নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে॥"

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রভৃতি ন্যায়, স্মৃতি পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ জগজ্জয়ী পণ্ডিতগণের অধ্যাপনা ও জ্ঞান চর্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুদূর দেশ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপে আসিত। এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী আছে। কথিত আছে, সর্ব্বপ্রথম একজন যোগী নবদ্বীপের গঙ্গার চরে একটি কুটিরে কয়েকটি ছাত্রকে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ ও ব্যায়াপ্তি শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহাদের পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পক্ষধর মিশ্র তৎকালে জগজ্জয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার; শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সেই পক্ষই জয়ী

হইত এবং তিনি যাহা কিছু শুনিতেন এক পক্ষকাল ধরিয়া অবিকল মনে রাখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় পক্ষধর। শলাকা পরীক্ষা এই প্রকার—একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহশলাকা সবলে পুঁথির উপর নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বশেষে যে পত্র খানি বিদ্ধ হয়, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাসুদেব এই ভাবে শত শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে মিথিলা ছাড়া অন্যত্র ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র যাহাতে ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি বা উহার কোন অংশ স্বদেশে না লইয়া যাইতে পারে তৎপ্রতি মিথিলার পণ্ডিতদিগের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বাসুদেব অনন্যসুলভ মেধাশক্তি বলে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র ও উদয়ন আচার্য্যের ন্যায় কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় গ্রন্থের প্রচলন ও অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রতিভার নিকট ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার একাধিপত্য আর টিকিতে পারে নাই। উত্তরকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ওড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও "অনুমান মণিব্যাখ্যা" প্রণেতা কণাদ প্রধান। রঘুনাথ বাসুদেবের নিকট পাঠ সমাপনান্তে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট প্রেরিত হন। পক্ষধর রঘুনাথের মেধা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হন এবং সভা করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে উপাধি বিতরণের ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। কথিত আছে রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরিয়া হরিঘোষ নামক একব্যক্তি প্রদত্ত গোশালায় তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার এত ছাত্র হইয়াছিল যে তাহাদের পাঠ অভ্যাসের কোলাহল বহু দূর হইতে শুনা যাইত; ইহা হইতেই "হরিঘোষের গোয়াল" এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। নবদ্বীপে বহুকাল হইতে ন্যায়ের চর্চা থাকিলেও রঘুনাথের সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণের মধ্যে একজন করিয়া প্রধান নৈয়ায়িক পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে "চিন্তামণি-দীধিতি" বা "নব্যন্যায়" সর্ব্বপ্রধান। নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জগদীশ তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রের যে সকল মূল্যবান ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন সে গুলি আজও যথাক্রমে "মাথুরী রহস্য" "ভবানন্দী" "রঘুদেবী" ও "জগদীশী" নামে পরিচিত। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের "ভাষা-পরিচ্ছেদ" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের ভাষ্য আজও ভারতের সর্ব্বত্র অধীত হয়; কথিত আছে তাঁহার পিতা বিদ্যানিবাস মুগ্ধবোধ ব্যকরণের টীকা লিখিয়া এদেশে কলাপ ব্যাকরণের পরিবর্ত্তে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন; তিনি বারাণসীতে জগৎগুরু নারায়ণ ভট্টকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সময়ে নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত চতুষ্পাঠী চালাইবার জন্য কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; কিন্তু রামনাথ অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন, সেজন্য রাজার নিকট হইতে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই এবং নবদ্বীপের নিকট বনমধ্যে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার টোল চালাইতেন, এজন্য তিনি বুনো রামনাথ নামে খ্যাত। নবদ্বীপের আনন্দরাম তর্কবাগীশ পূজার অর্ঘ্য দিবার সুবিধার জন্য কোশার মুখ বড় করিয়াছিলেন, তদবধি কোশার অপর নাম আনন্দার্ঘ্য।

ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায় স্মৃতি শাস্ত্রেও বহুকাল অবধি নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকা "মন্বর্থ মুক্তাবলী" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী কুল্লুকভট্ট অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ